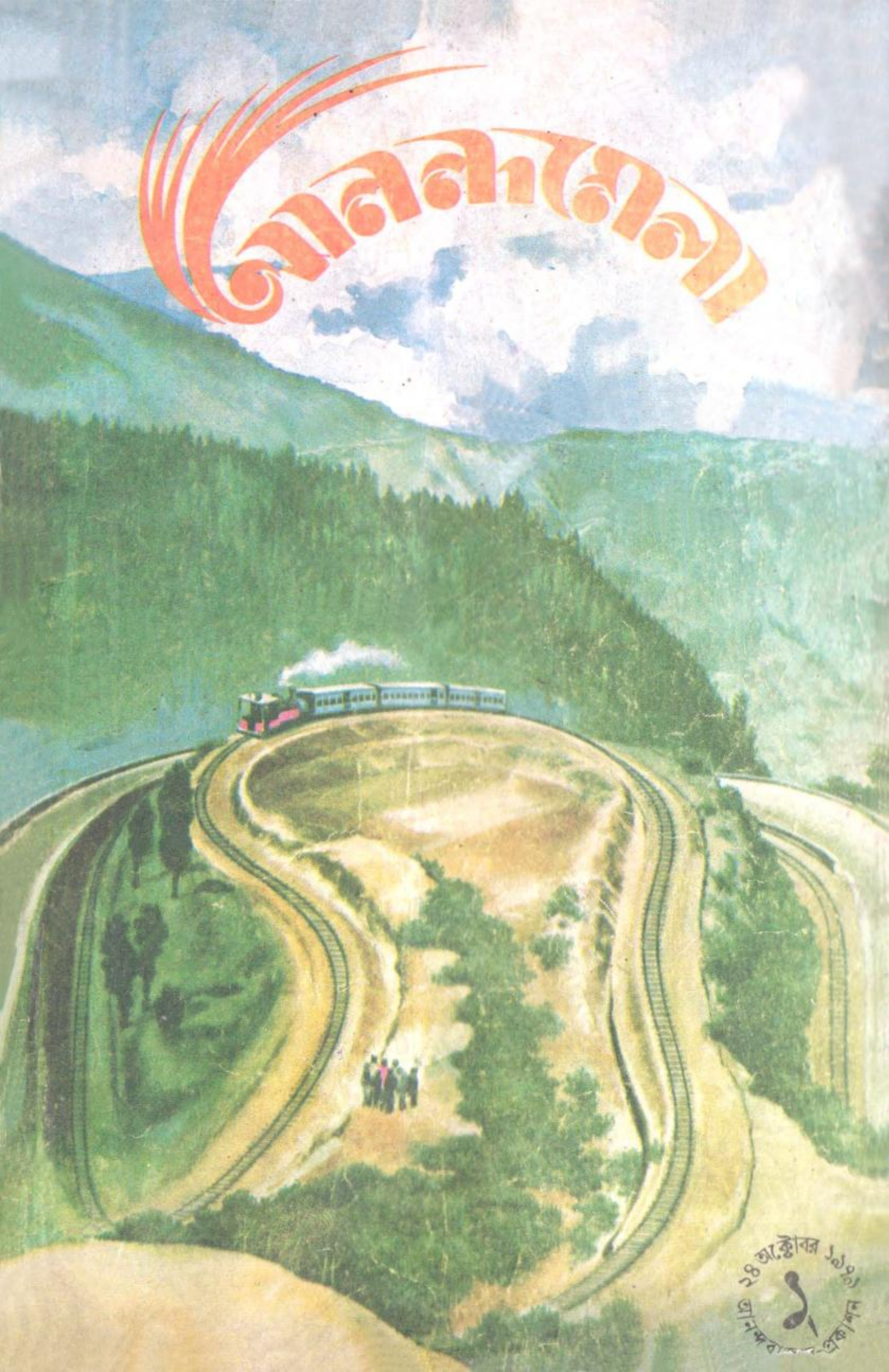

২৪ অক্টোবর ১৯৭৯
আনন্দবা- প্রকাশন

একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল···
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!

লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

লেবুর মত চনমনে তরতাজা

লিনটাস-LR.28-203 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আনন্দমেলা

৭ কার্তিক ১৩৮৬ ২৪ অক্টোবর ১৯৭৯ ৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা

ছড়া

ছড়ার বচন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ১০
ওই যে আমার। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩
গান শেখা। সুশীলকুমার গুপ্ত ৫৭

গল্প

রাতবিরেতে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১১
সন্তুদের কাকাতুয়া। আশিস ঘোষ ৩১
একা তাতুন। উত্তম দাশ ৪৮
লেখক হওয়া সহজ নয়। আনন্দ বাগচী ৫৪
যূথীর তারা। অরূপরতন ঘোষ ৬২

বিশেষ রচনা

খেলনা-রেলে একদিন। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪

উপন্যাস

কে। বিমল মিত্র ১৫
পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭

আত্মকথা

খেলতে-খেলতে। চুনী গোস্বামী ৩৭

চিত্রকাহিনী ও কমিকস

সদাশিব ১৯, রোভার্সের রয় ২০, টিনটিন ২২
বিশ্বকাপ ২৪, টারজান ২৬, বাঘা ৬০, গাবলু ৬৪

লেখাপড়া

ভাষার খেলা। কুন্তক ২৫
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৪৫

খেলাধুলো

গাভাসকার অ্যাণ্ড কোং। অলোক দাশগুপ্ত ৫১
পাহাড়-চূড়ায় মোহনবাগান। অশোক দাশগুপ্ত ৫৩

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, মণিমেলার খবর ৪১
তোমাদের পাতা ৪৬, নদনদী ৫৯
ছবির মজা ৬৩, আঁকো-শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ বিমল দাস

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাসম্পাদিতা রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

খোলা চিঠি

প্রিয় বন্ধুরা,

আনন্দমেলায় লেখা আমার চিঠি পড়ে তোমাদের ভাল লেগেছে জেনে সত্যি খুশী হয়েছি।

রোজই তো বেশ কয়েকটা করে তোমাদের চিঠি পাচ্ছি। নিজেদের শহরটা সম্বন্ধে জানতে চাইছ তোমরা, সত্যি সুখের কথা।

সেই সঙ্গে আমারও তো কিছু কিছু কৌতূহল জমে যাচ্ছে। যেমন ধর,—তোমাদের বেশ কয়েকটা চিঠিতে এবছর বর্ষায় গাছ লাগানোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম।

কৈ তোমাদের কারো চিঠিতে তো তার জবাব পেলাম না?

তাহলে কি আমি এই ভেবে নেবো যে "ওয়ার্ক এডুকেশন" ক্লাসের জন্যই শুধু তোমরা কলকাতা সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াতে চাইছো? বই খাতার বাইরেও তো একটা দুনিয়া আছে। অবশ্য আমাদের অনেকের কাছেই কলকাতাটাই হল দুনিয়া। কেননা এই শহরেই আমাদের জন্ম, কর্ম, রুজি-রোজগার, শিক্ষা-দীক্ষা এবং জীবন। এই শহরটাকে চিনতে হলে এখানকার মানুষদের চিনতে হবে—সেই সব মানুষ যাঁরা সমাজের নীচুস্তরে আছেন। ব্যক্তিগতভাবে তোমরা হয়ত অনেকেই বড় হবে। কিন্তু নিজে বড় হওয়ার চেয়েও বড় কথা হল শহরটাকে ভাল করা বা বড় করা আর অন্য সবাইকে সাহায্য করা। কথাটা খুব বড় হলেও, কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও, আমাদের চেষ্টাটা কিন্তু সামান্য হলেও চলে।

যেমন প্রত্যেকে যদি একটি করে গাছ বোনো, প্রত্যেকে যদি একজন গরীব ঘরের ছেলেকে শিক্ষিত কর, যদি প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি কল থেকে জলের অপচয় বন্ধ কর—তাহলে সেটাই হবে বিরাট সাফল্য। কেন জান? তাহলে আগামী পাঁচ বছরে কলকাতা সবুজ হয়ে যাবে, অশিক্ষিতের হার শতকরা ৩০ ভাগ কমে যাবে আর জলের অভাব থাকবে না। বিশ্বাস কর এগুলো বানানো কথা নয়। অসম্ভবও নয়।

—একজন কলকাতাবাসী

জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে প্রচারিত।

খেলনা-রেলে একদিন

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার সঙ্গে যখন তার দেখা হল, তার বয়স তখন একশো বছর তিন মাস পনেরো দিন। জন্মেছিল ১৮৭৯ সালে। জন্মেই কেউ বড় হয়ে একা একা হাঁটতে পারে না। তবে বড় হতে তার সময় লেগেছিল মোটে এক বছর। ১৮৮০'র ১৮ মার্চের ভোরবেলা সে প্রথম গুটগুট করে পাহাড়ি পথে চলতে-চলতে শিলিগুড়ি থেকে তিনধরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেদিন কী ধুমধাম! সারা পথে কত লোক তার গলায় মালা দেওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল। পথের ধারে কোথাও বাজছিল বাজনা, কোথাও হচ্ছিল গান। ভারতবর্ষে তখন ছিল সাহেবদের রাজত্ব। সুতরাং ওকে দেখতে সাহেবমেমদেরও ভিড় কিছু কম হয়নি। বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যার অ্যাশলি ইডেন তো ওর সঙ্গে-সঙ্গেই চললেন সারা পথ। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাওয়ার মতো বড় হতে তার অবশ্য আরও এক বছর সময় লেগেছিল। তারপর ১৮৮১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সে সমানে দার্জিলিং পর্যন্ত পাহাড়ি পথে ওঠানামা করেছে। এখন অবশ্য ওর যাত্রা শুরু হয় শিলিগুড়ি থেকে নয়, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে।

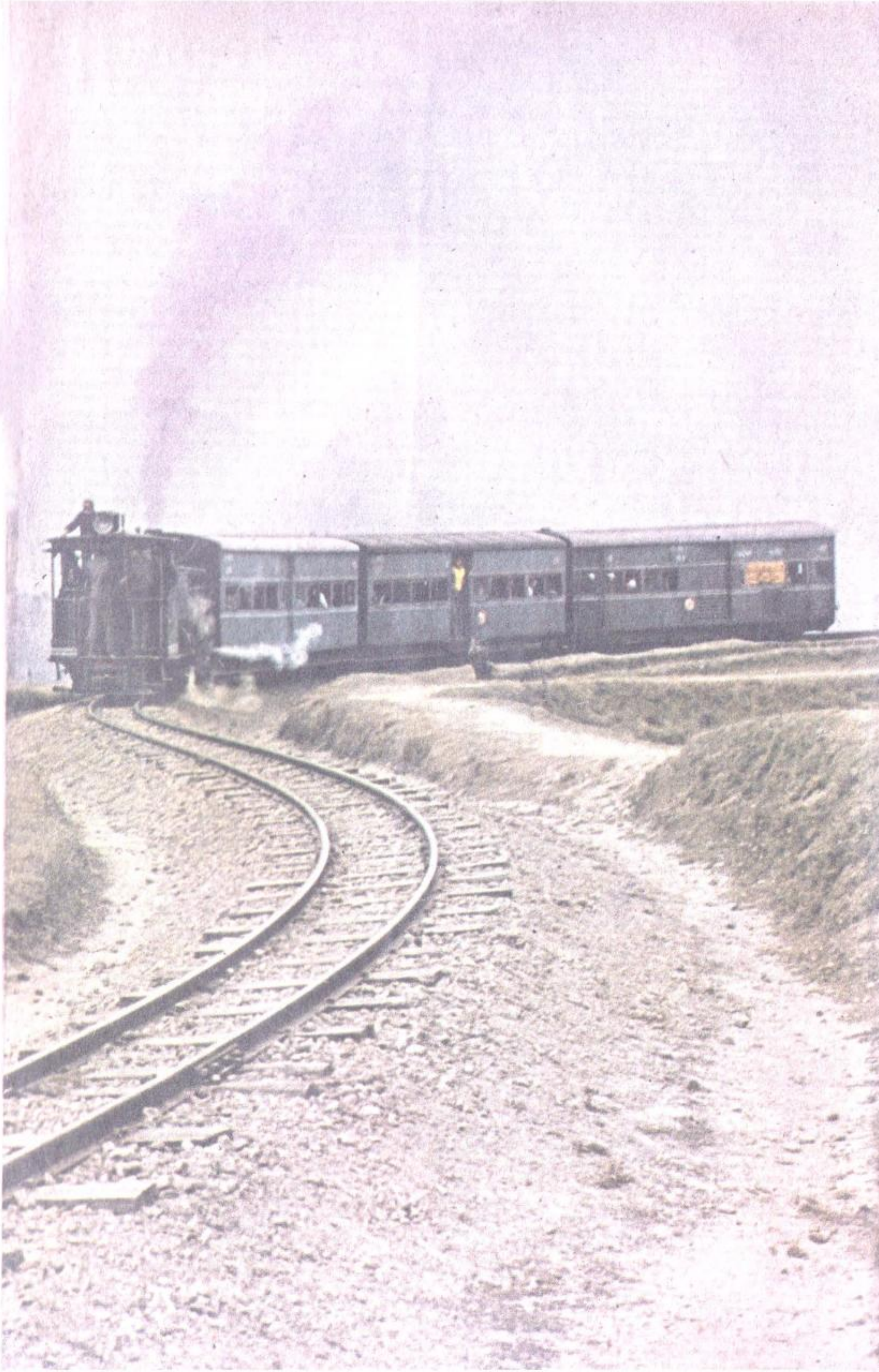

যদিও একশো বছর বয়েস, সে এখনও তোমাদের মতো ছোট। এবং ছোটদের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব বেশি। তাকে দেখতে এত ছোট যে, তার নাম দেওয়া হয়েছে টয় ট্রেন বা খেলনা রেল। তার বগি বা কমপার্টমেন্টের সংখ্যা মাত্র চার। ছোট বড় সবাই এই টয় ট্রেন দেখতে বা ওতে করে দার্জিলিঙে যেতে খুব মজা পায়। আকারে খুদে হলেও, টয় ট্রেন যা পারে বড় বড় রেলগাড়িগুলো তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। 'রাজধানী' বা 'গীতাঞ্জলি'র মতো সুন্দর নামের জাঁদরেল ট্রেনগুলোকে একবার বলো পাহাড়ি পথে কোথাও যেতে, দেখবে সব ভয় পেয়ে কেমন উলটো দিকে তাকিয়ে থাকবে। এইসব বড়বড় ট্রেনগুলোর একটিও কখনো দার্জিলিঙে ঢুকতে পারেনি বলে সেখানকার খুদে রেলগাড়ির সঙ্গে ওদের পরিচয় বা বন্ধুত্ব হয়নি। টয় ট্রেনের বন্ধুদের মধ্যে রয়েছে দার্জিলিঙে বেড়াতে-আসা ছেলেমেয়েরা, পাহাড়ি পথের অজস্র ফুল, প্রজাপতি, পাখি আর পথের পাশে ঝিরঝিরে ঝর্না, আর ঠান্ডা হাওয়ায় উড়ে-আসা ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, আর শাল-সেগুন বনের মিষ্টি গন্ধ।

এই ছোট্ট রেলগাড়ির জন্মদিনেই আমি দার্জিলিং আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কলকাতার ঝামেলা থেকে ছুটি পেতে দেরি হল। ফলে, ওর সঙ্গে যখন জুলাই মাসে দেখা হল ততদিনে ওর বয়েস একশো পেরিয়ে আরও তিনমাস চলছে।

জন্মদিনে ওকে দেব বলে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলাম কিছু চকোলেট। যদিও আমি জানতাম যে, ছোট ছোট রেলগাড়িরা কখনও চকোলেট খায় না। আমেরিকা বা ইউরোপের কোনও কোনও পার্কে বা চিড়িয়াখানায় দার্জিলিঙের টয় ট্রেনের চেয়েও বাচ্চা রেলগাড়ি আছে। ছোটরাই বেশি ঘুরে বেড়ায় এইসব গাড়িতে। ফলে সারা গাড়ি ভরে থাকে আইসক্রীম আর চকোলেটের গন্ধে। আমার ধারণা, বাচ্চা রেলগাড়িগুলো কয়লার গন্ধের চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসে চকোলেট-আইসক্রীমের গন্ধ।

টয় ট্রেনের জানলা দিয়ে পথের দুপাশে পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের দিয়ে দিলাম পকেটের চকোলেটগুলো। এদের সঙ্গে খুদে রেলগাড়ির খুব ভাব। খেলনা রেল কখন ছুটবে কোন কোন গ্রামের মধ্য দিয়ে, বাড়ির পাশ দিয়ে, পাঠশালার কোল ঘেঁষে, খেলার চত্বরের ধার দিয়ে, সে-খবর এইসব ছেলেমেয়েরা ঠিকঠিক জানে। ওরা সারি দিয়ে দাঁড়ায় ছোট্ট

রেলগুলোর পথের ধারে। কেউ হাত নাড়ে, কেউ লাফায়। টয় ট্রেন এত আস্তে চলে যে, ইচ্ছে করলে নেমে গিয়ে এদের কাউকে একটু আদর করে দৌড়ে এসে আবার ট্রেনে উঠে পড়া যায়।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং দূরের পথ নয়। কিন্তু ঠুকঠুক করে চলতে-চলতে এই পথটুকু পেরুতে খুদে রেল প্রায় সারাদিন লাগাল। তবে কিনা ছুটির মেজাজ। হাতে কাজ নেই, তাড়াও নেই। রেলগাড়িটির জানলার কাছে এসে বসলাম। হাতের কাছে রেখে দিলাম কিছু কমলালেবু। চোখের সামনে সিনেমার পর্দার মতো একের পর এক রঙিন ছবি পালটে যেতে লাগল।

শিলিগুড়ি পার হয়ে ছোট্ট রেলগাড়ি আমাদের নিয়ে এল দাগাপুর চা-বাগানের মধ্যে। এখনও পাহাড়ি পথের ওঠানামা শুরু হয়নি। তাই দাগাপুরের চা-বাগান সবুজ সমতল কার্পেটের মতো মনে হয়। এই কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে খেলনা রেল চলে আসে সুকনায়। সুকনা থেকেই শুরু হল চড়াই। ট্রেনের জানলায় ভেসে উঠল অন্য ছবি। আমাদের মনে হল দু'পাশে শাল আর সেগুনের অরণ্য ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। ট্রেনের জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল গাছের গায়ে ঠান্ডায় জমে আছে টুকরো-টুকরো মেঘ, অনেকটা আটকে যাওয়া ঘুড়ির মতো।

সুকনা থেকে কিছুদূর যেতেই দেখলাম টয় ট্রেনের লাইনটা বাচ্চা মেয়েদের মাথায় বাঁধা বাহারি ফিতের মতো গোল হয়ে ঘুরে গেছে চড়াইয়ের পথে। একে বলে লুপ। খুদে রেলের পাহাড়ি পথে এমনি লুপ আছে অনেক। সুকনার পর থেকে চড়াইয়ের পথে উঠতে উঠতে খেলনা ট্রেন শুরু করল এক মজার খেলা। প্রতি বাঁকের মুখে গোল হয়ে ঘোরবার সময় আমাদের নিজেদের ট্রেনটিকে জানলা দিয়ে নিজেরাই দেখতে পাচ্ছিলাম। সুতরাং এক কমপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা অন্য কমপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জানলা দিয়ে ভাব জমিয়ে ফেললে। কিন্তু বাঁক শেষ হতেই ট্রেনটি যেই সোজা হয়ে যায় অমনি বন্ধুরা সব চোখের নিমেষে উধাও। যতক্ষণ না আবার ট্রেনটি গোল হয়ে বাঁক নিচ্ছে, ততক্ষণ তাদের দেখা পাওয়ার কোনও উপায় নেই।

এমনি বাঁক ঘুরে ঘুরে দেড় হাজার ফুট ওপরে আমরা যেখানে পৌঁছলাম সে-জায়গার নাম রংটং। এখানে খুদে ট্রেনটি জল খাবার জন্যে একটু থামতেই আমরা নেমে পড়লাম

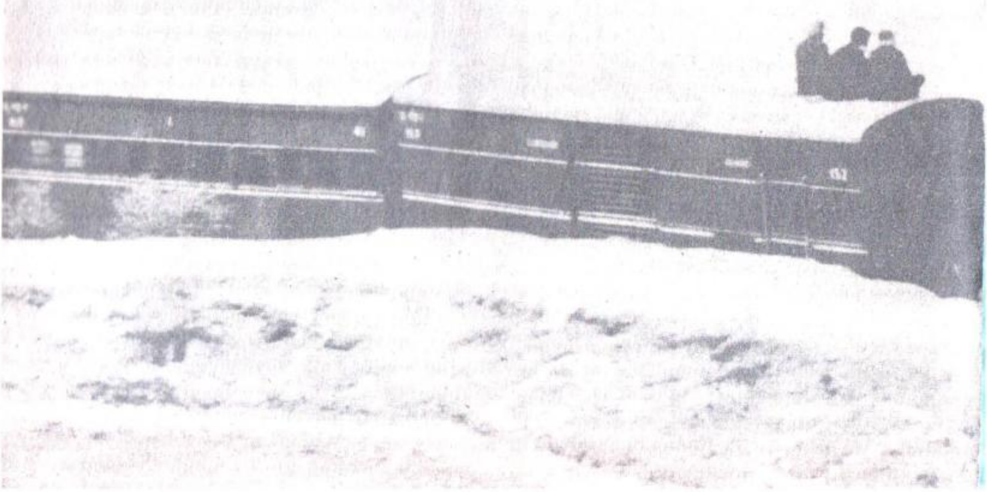

স্টেশনটিতে। পাহাড়ি পথের পরিশ্রমে ছোট্ট রেলগাড়িটার খালি খালি জলতেষ্টা পায়। একেবারে পথের পাশে যেখানেই ও দেখতে পায় পাহাড়ি ঝর্না ঝমঝম করতে-করতে নেমে এসেছে, সেখানেই ও দাঁড়িয়ে পড়ে একটু জল খেয়ে নেয়। আমরাও বরফের মতো ঠান্ডা জলে টাটকা জলে চোখ-মুখ ধুয়ে নিই। এইসব ঝর্নার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হল পাগলাঝোরা। টয় ট্রেনের জানলায় বৃষ্টির মতো উড়ে আসে পাগলা ঝোরার জল। জলের সঙ্গে ভেসে আসে অনেক ওপরের পাহাড়ি ফুলের গন্ধ। আর কোনও রেলগাড়ির সঙ্গে ঝর্নার এমন ভাব কখনও তোমরা কেউ দেখেছ?

রংটংয়ের পর চুনভাটি, তিনধরিয়া, গয়াবাড়ি, কার্সিয়াং আর টুন পেরিয়ে খেলনা রেল আমাদের নিয়ে এল প্রায় সাড়ে ছ'হাজার ফুট ওপরে সোনাদায়। তোমরা যদি কখনও দার্জিলিঙে আসো, কয়েকটা দিন থেকে যেও এই সুন্দর সোনাদায়। খেলনা ট্রেন কার্সিয়াং এবং সোনাদায় একেবারে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। চলে কোনো বাড়ির বারান্দার তলা দিয়ে, কারও বাগানের পাশ দিয়ে। মনে হয়, লাগল বুঝি কোনও বাড়ির সঙ্গে ধাক্কা। কোনো পাহাড়ি স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজে। বাড়ি-ফিরতি ছেলেমেয়েরা আমাদের খুদে রেলটিকে দেখে হাততালি দেয়। কেউ-কেউ রুমাল ওড়ায়। সোনাদার পরে ছোট্ট রেল পৌঁছয় ঘুমে। ঠান্ডা মেঘে ঢাকা, সবুজ অরণ্যে ঘেরা, স্বপ্নের মতো সুন্দর ঘুম প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট ওপরে। এখানে এক মজার অভিজ্ঞতা হল আমাদের। ছোট্ট রেলগাড়িটা আমাদের কোথায় নিয়ে এল জানো? একেবারে জমজমাট বাজারের মধ্যে! ভাবো তো, যদি একটা আস্ত রেলগাড়ি ঢুকে পড়ে হাতিবাগান বাজার,

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কিংবা গড়িয়াহাট বাজারের ভেতর, তাহলে দৃশ্যটা কেমন হবে!

ঘুম থেকে দার্জিলিং যেতে গেলে কিন্তু আবার নীচের দিকে নামতে হয় প্রায় হাজার ফুটের মতো। এই পথেই পড়ে সবচেয়ে বড় আর সুন্দর লুপ—বাতাসিয়া। বাতাসিয়ায় পৌঁছে মনে হল আমাদের ছোট্ট রেলগাড়িটা একটা সাপ হয়ে সরসর করে পাহাড়ি পথ দিয়ে দার্জিলিঙের দিকে নেমে যাচ্ছে। পথের ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে লেখা ওয়েলকাম টু দার্জিলিং। বিকেল হয়ে এল। চাপ চাপ ঠান্ডা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। এমন সময় ছোট্ট রেলের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে জানালার পাশে চা নিয়ে এল বছর দশেকের একটি ছেলে। গাল দুটো তার আপেলের মতো লাল। নাম জিজ্ঞেস করতেই সে একগাল হেসে বলল, টুং।

ফোটো অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

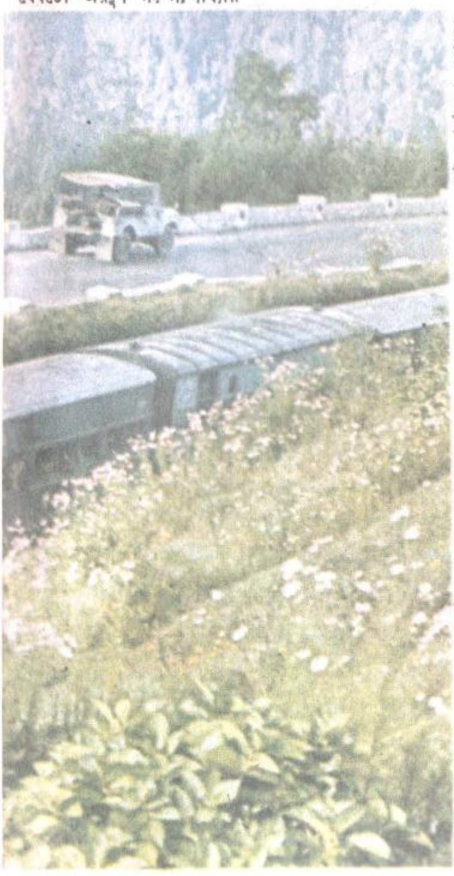

ফোটো বিপুল গুহ

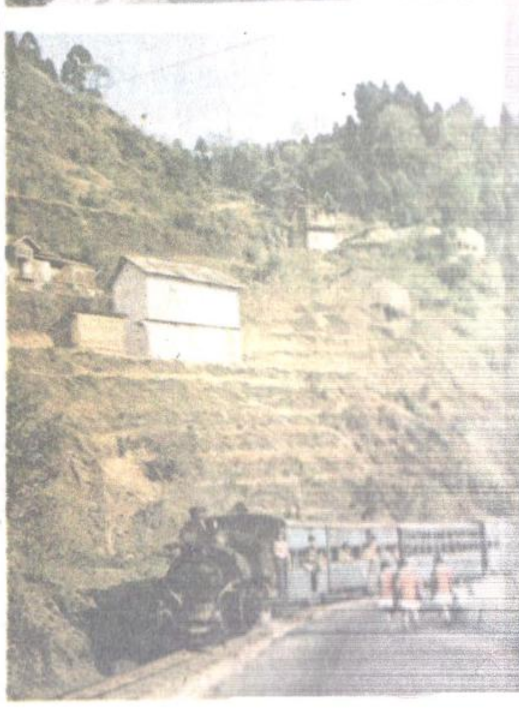

ছড়ার বচন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সেই যে একটা দেয়াল
মনের ভুলে লিখে ফেলেই
চমকে উঠে হঠাৎ হল খেয়াল
এই সেরেছে ! মিলটা ধরে
আসবে তো ঠিক শেয়াল।
এসেই তো তার বাপের নামে
করবে খেয়াল দাবি
না মানলেই কেড়ে নেবে
ছড়ার দেশের দরজা খোলার চাবি।
এই ভাবনায় হচ্ছি সারা
দেখে সবাই হাসে
বলে, অমন কাঁপছ কেন,
আজগুবি এক ত্রাসে ?
দেয়াল দাবি করবে শেয়াল
প্রমাণ কোথাও আছে কি এক কড়া?
না বলে আর পারি নাকো
প্রমাণ তো এই ছড়া।
সবাই ভাবে ছড়ার রাজ্য
বুঝি মগের মুলুক,
নেইকো মানা যার যা খুশি
উল্টো-পাল্টা বলুক।
মোটেই তা নয়,
ছড়ার বচন বজ্র-হেন গাঁথা
একবারটি বাঁধা হলে
ভাঙতে স্বয়ং পারেন না বিধাতা।
টাপুর টুপুর বৃষ্টি এলেই
ডাকবে নদীর বান,
সাধ্যি কী তিন কন্যা না যে
বাপের বাড়ি যান।
বাজতে-বাজতে গেলে ঢুলি
যেতেই হবে কমলাপুলি,
নেইকো উপায় একটিবারও
যাবে যে পথ ভুলি।
যেখানে হোক, যেমনই হোক
দেখলে একটা দেয়াল,
ছড়ার রাজ্যে জানবে যে তার
মালিক হবেই শেয়াল।

ছবি দেবাশিস দেব

রাতবিরেতে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মুরারিবাবু খুব বিপদে পড়েছেন। রাত-দুপুরে বাড়ির উঠোনে টুপটুপ করে ঢিল পড়ে। কারা ছাদে হেঁটে বেড়ায় ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ। বেরিয়ে কিন্তু কাউকেও দেখতে পান না। টর্চ জেলে বাড়ির চারপাশটা বৃথা খোঁজাখুঁজি করেন। নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা। পাড়ার মধ্যেও নয় যে ছেলেরা দুষ্টুমি করবে। তাছাড়া তাজ্জব ব্যাপার, ঢিল পড়ার শব্দ হয় এবং তাঁর টাকেও পড়ে, অথচ ঢিল দেখতে পান না।

তাহলে? এ নিশ্চয় অশরীরীদের কাজ। মুরারিবাবুর বন্ধু ফৈজুদ্দিন এ শহরের নাম-করা উকিল। তিনি এসে সব শুনে বললেন, "দেখ মুরারি! আমার মনে হচ্ছে, তুমি জিনের পাল্লায় পড়েছ।"

মুরারিবাবু বললেন, "জিন? সে আবার কী? সবাই তো বলছে, এ ভূতেরই কাণ্ড।"

"উঁহু। ভূত থাকে বনবাদাড়ে, জলার ধারে। নিরিবিলি জায়গায়। পারতপক্ষে তারা মানুষের কাছ ঘেঁসে না। কারণ, মানুষ মরেই তো ভূত হয়। বেঁচে থাকার ঝক্কি কতটা, মানুষ মরার আগে হাড়ে-হাড়ে জেনে যায়। ঘেন্না ধরে যায় মনুষ্যজীবনে। কাজেই মরে ভূত হওয়ার পর কোন পাগল আর মনুষ্যজীবনের আনাচে-কানাচে আসতে চাইবে বলো!"

মুরারিবাবুর মনে ধরল কথাটা। ফৈজুদ্দিন উকিলের যুক্তির প্যাঁচে কত বাঘা-বাঘা হাকিম হার মানেন। মুরারিবাবু বললেন, "হুঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু জিন কী?"

ফৈজুদ্দিন খুশি হয়ে বললেন, "জিনদের ব্যাপারস্যাপার অবিকল ভূতদেরই মতো। তবে তারা একরকম প্রাণী বলতে পারো। তারা মানুষের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। এঁটো-কাঁটা, আবর্জনা, গোবর, হাড় এইসব নোংরা জিনিস তাদের খাদ্য। ইচ্ছে করলেই তারা

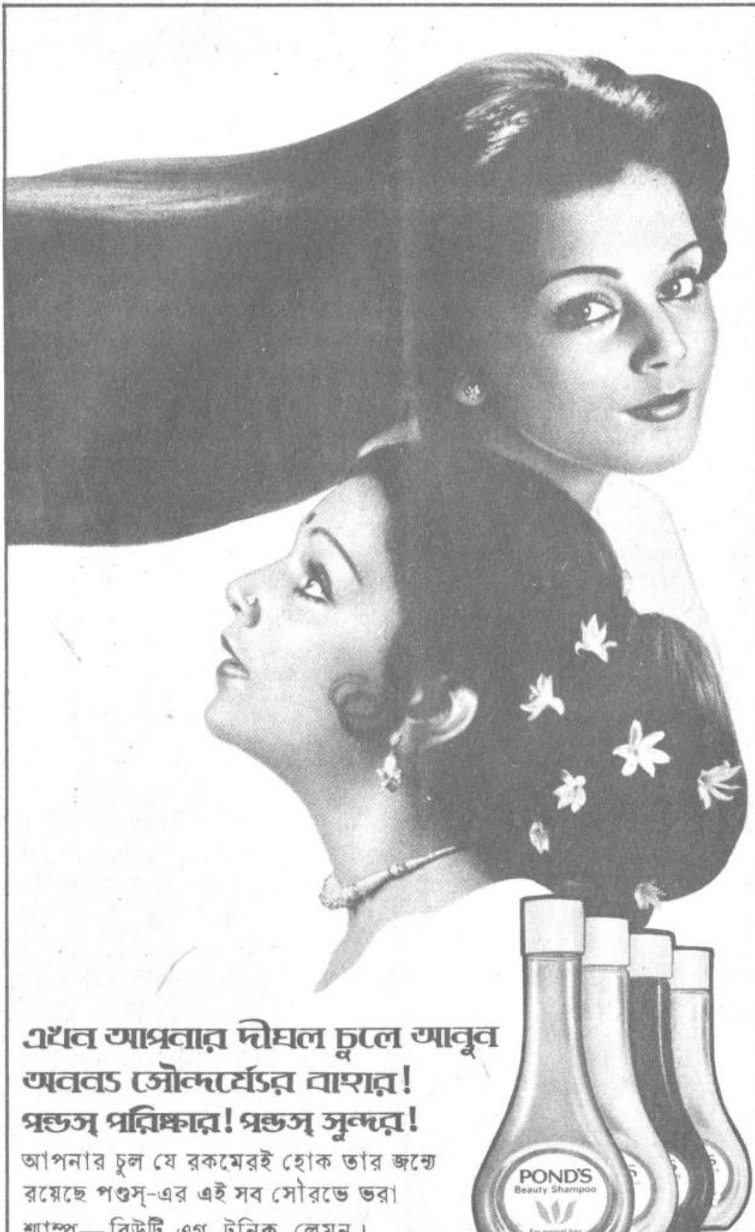

লিনটাস-PIL. SH. 2-1810 BG

অন্য-শ্য হতে পারে। আবার ইচ্ছে করলেই নানারকম রূপ ধরতেও পারে।"

"তারা থাকে কোথায়?"

"পোড়ো বাড়িতে। চিলেকোঠায়। ছাদে। কখনও বাথরুমের ঘুলঘুলিতে।" ফৈজুদ্দিন চাপা গলায় বললেন। "আমার বাথরুমের ঘুলঘুলিতে একটা জিন ছিল। বুঝলে? রোজ চান করতে ঢুকতুম, আর বেটা মুখ বাড়িয়ে আমায় ভেংচি কাটত। দুটো জ্বলজ্বলে নীল চোখ। বাপ্স্! এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

মুরারি আঁতকে উঠে বললেন, "দেখতে কেমন জিনটা? খুব ভয়ঙ্কর চেহারা নিশ্চয়?"

"তত কিছু না।" ফৈজুদ্দিন কড়ে আঙুল দেখালেন। এইটুকুন। একটা টিকটিকির মতো বিদঘুটে।

"তারপর? তারপর? কীভাবে সেটা তাড়ালে?"

"কালা ফকিরকে ডেকে আনলুম। সে ব্যাটাকে আতরের শিশিতে পুরে পুকুরে ফেলে দিয়ে এল। তুমি কালা ফকিরের কেরামতি তো জানো না! তাকে দেখলে জিনেরা লেজ ফেলে রেখে পালায়।"

মুরারির একটু খটকা লাগল। বললেন, "পালায় যদি, শিশিতে পোরে কীভাবে?"

ফৈজুদ্দিন ফ্যাঁচ্ করে হাসলেন। "সেটাই তো কালা ফকিরের কেরামতি। তুমি এক্ষুনি ওর কাছে যাও। দেখবে ফকিরসায়েব এসে তোমার বাড়ির জিনগুলোকে বস্তায় পুরে সমুদ্দুরে ফেলে দিয়ে আসবে।"

মুরারি লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু ফের খটকা লাগল মনে। বললেন, "বস্তা কেন? ওই যে বললে আতরের শিশির কথা?"

"বুঝলে না? তোমার বাড়ির জিন তো ঘুলঘুলির খুদে জিন নয়। একটা-দুটোও নয়—একেবারে এক ঝাঁক। তাছাড়া তারা ভেংচি কাটে না, ঢিল ছোঁড়ে। ছাদ কাঁপিয়ে হেঁটে বেড়ায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, তাদের সাইজ বড়। যাক্ গে, আমার আদালতে যাওয়ার সময় হল। তুমি এক্ষুনি কালা ফকিরের কাছে যাও।"

ফৈজুদ্দিন ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। একটু পরে মুরারিবাবুও বেরিয়ে পড়লেন। কালা ফকির থাকে শহরের বাইরে এক নির্জন জায়গায়। নিঝুম জায়গা। কোনো পীর-সায়েবের কবর আছে। ফকির সেই কবরে আগরবাতি আর সাঁঝবাতি জ্বালে। কদাচিৎ ভক্তরা এসে সিন্নি আর দশ-বিশ পয়সা মানত দিয়ে যায়।

মুরারিবাবুকে দেখেই কালা ফকির চোখ পাকিয়ে বলল, "কী? জিনের পাল্লায় পড়েছ বুঝি? ভাগো, এখন আমার যাবার সময় নেই।" কালো আলখেল্লাপরা পাগলাটে চেহারার ফকিরকে দেখে মুরারিবাবু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তার ওপর এই কড়া ধমক। কিন্তু উপায় নেই। খুব ভক্তি দেখিয়ে একটা টাকা ফকিরের পায়ের কাছে রেখে বিনীতভাবে বললেন, "দয়া করে একবার যেতেই হবে বাবা। রাতে ওদের অত্যাচারে ঘুম হয় না। বড্ড বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে।"

ফকির টাকাটা ভাল করে দেখে নিয়ে আলখেল্লার ভেতরে চালান করে দিল। তারপর বলল, "ঠিক আছে। বাড়ি গিয়ে একটা বস্তা যোগাড় করে রাখো। সব নিশুতি হলে রেতের বেলা যাব'খন।"

কালা ফকির সন্ধ্যা গড়িয়ে একটু রাত করে এল। বস্তাটা ভাল করে দেখে নিল ফুটো আছে নাকি। তারপর সেটা নিয়ে একটা অষ্টাবক্র লাঠি নাচাতে নাচাতে সে অন্ধকারে বাড়ির চারদিকে চক্কর দিতে থাকল। বিড়বিড় করে কী সব আওড়াচ্ছিলও। এদিকে মুরারিবাবু, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে-দের সে ঘরের ভেতর থাকতে বলেছে। খবর্দার, কেউ যেন না বেরোয়। বেরুলে বিপদ।

কতক্ষণ পরে ফকির চেঁচিয়ে ডাকল, "বেরিয়ে এসো সব। কেল্লা ফতে। সবকো পাকাড় লিয়া।"

সবাই বেরিয়ে গিয়ে দেখল, কালা ফকির বস্তার মুখটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর সেই বাঁকাচোরা লাঠিটা দমাদ্দম চালাচ্ছে। "বল ! আর জ্বালাবি ? বল, কখনো ঢিল ছুঁড়বি ?"

মুরারিবাবুর স্ত্রী নরম মনের মানুষ। কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, "ওগো! ফকির-সায়েবকে বারণ করো! আহা, অত করে বেচারাদের মারে না! মরে যাবে যে!"

ফকির একগাল হেসে বলল, "ঠিক আছে। মা-ঠাকরুন বলছে যখন। তো কই, রাহাখরচ দাও। সমুদ্দুরে ফেলতে যাব। সমুদ্দুর কি

এখানে? তের নদীর পারে। ট্রেনে বাসে জাহাজে কতবার চাপতে হবে, তবে না!"

রাহাখরচ নিয়ে ফকির চলে গেল। বস্তা কাঁধে নিয়েই গেল। মুরারিবাবুর বড় মেয়ে বিলু চোখ বড় করে বলল, "বাবা, বাবা! বস্তার ভেতর কেমন একটা শব্দ হচ্ছিল শুনেছ?"

তার মা বললেন, "চুপ, চুপ। বলতে নেই!"

আজ সবাই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে আরও রাত হল। বাড়ি নিরাপদ। তাই উঠোনে মুরারিবাবু মহানন্দে পায়চারি করতে থাকলেন। গল্প-গুজবও করলেন নানারকম। সব নিশুতি নিঃঝুম হয়ে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। জোনাকি জ্বলছে গাছপালায়। সেই সময় রাত বারোটা পাঁচের ডাউন ট্রেন শিস দিতে দিতে আসছে। রেল লাইন বাড়ির ওপাশ দিয়ে গেছে। বাড়ি থেকে উঁচুতে রেললাইনটা। ট্রেন গেলে উঠোন থেকেও দেখা যায়। ট্রেনের আলো ঝলসে দিয়ে যায় বাড়িটাকে। বিলুর ভাই অমু বলল, "বাবা, ফকির এই ট্রেনেই যাচ্ছে।"

মুরারিবাবু বললেন, "হ্যাঁ। বে অফ বেঙ্গল যেতে হলে..."

হঠাৎ তাঁর কথা থেমে গেল। লাফিয়ে উঠলেন। এ কী! ফের তাঁর মাথায় ঢিল পড়ল যে? শুধু তাই নয়, কালো-কালো আরও ঢিল উঠোনে তাঁর আশেপাশে টুপটুপ করে পড়ছে। ট্রেনের আলোটা সোজা এসে পড়েছে তাঁর গায়ে। মুরারিবাবু আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। মুখে কথা নেই। ট্রেন চলে গেলে ঝলসানো আলোটাও সরল। তখন মুরারির মুখে কথা এল।—"ঘরে ঢোকো! ঘরে ঢোকো!" বলে উঠোন থেকে বারান্দায় উঠলেন।

তারপর রাগে দুঃখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে বললেন, "ব্যাটা ভণ্ড ফকির স্রেফ ঠকিয়ে গেল! ওঃ, কী ভুল না করেছি!"

বিলুর মা বললেন, "সে কী! কেন, কেন ও-কথা বলছ?"

"এইমাত্র ঢিল পড়ল দেখলে না! আমার মাথাতেও পড়ল! মুরারি টাকে হাত বুলোতে গিয়ে ফের লাফিয়ে উঠলেন। ওরে বাবা! আমার কানের পাশে কী যেন রয়েছে! ঢিল! ভুতুড়ে ঢিল আটকে রয়েছে।"

অমু বাবার কানের পাশ থেকে কালো কী একটা খপ করে ধরে ফেলল। তারপর বলল, "ও বাবা! এটা তো চামচিকে!"

"অ্যাঁ! মুরারি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। অমু চামচিকেটা ছেড়ে দিতেই থামের গায়ে আটকে গেল। কিন্তু বলা যায় না, জিনেরা কতরকম রূপ ধরে! তাই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "মারু, মারু! জুতোপেটা কর্!"

সেই সময় অমু বলে উঠল, "বাবা, ইউরেকা!"

"ইউরেকা মানে?"

অমু রহস্যভেদী গোয়েন্দার মতো ভারিক্কি চালে বলল, "মাত্র চামচিকে। স্রেফ চামচিকে বাবা! বুঝলে না? ট্রেনের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত চামচিকেগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর টুপটুপ করে পড়তে থাকে! আমরা ভাবি ঢিল পড়ছে!"

মুরারিবাবু সন্দিগ্ধভাবে বললেন, "কিন্তু ছাদের ধুপধুপ শব্দ?"

অমু তেমনি গম্ভীর হয়ে বলল, "শব্দ হোক না। আমি ছাদে যাব।"

তার মা বললেন, "ওরে না, না! যাসনে অমু। ওই শোন, কারা হেঁটে বেড়াচ্ছে! ওগো, কাল বরং ওঝা ডেকে আনো। মনে হচ্ছে, ওরা জিনটিন নয়, অন্য কিছু।"

মুরারি সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। ভূতই বটে। কালই হরিপদ ওঝার বাড়ি যাব।"

ওদিকে তক্ষুনি অমু ছাদে চলে গেছে টর্চ নিয়ে। ছাদ থেকে তার গলা শোনা গেল। "বাবা। মা। ইউরেকা, এগেন ইউরেকা!"

এঁরা সবাই উঠোনে নামলেন ভয়ে-ভয়ে। কী দস্যি ছেলে রে বাবা! মুরারি বললেন, "কী রে?"

"ছুঁচো, বাবা।"

"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ বাবা! আর কিছু না—স্রেফ ছুঁচো ডন টেনে বেড়াচ্ছে। দেখবে এসো!"

মুরারি নিশ্বাস ফেলে বললেন, "হুঁ। নেমে আয়।"

ছাদে রাজ্যের আবর্জনা জমে আছে। পুরনো বাড়ি। ছুঁচোর আড্ডা হতেই পারে। রাতবিরেতে একদঙ্গল ছুঁচো ছাদে ডন টানে। কেত্তনও গায় নেচে-নেচে। তাই শব্দ হয়। বাড়িটা এবার মেরামত করে কলি ফেরানো দরকার। চামচিকে, ছুঁচো, ইঁদুর, আরশোলা টিকটিকির আড্ডা হয়ে গেছে।

কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর মাতৃহারা ছেলে জ্যোতি পার্কে হারিয়ে গেছে। অনামা ভদ্রলোক চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এ-ব্যাপারে যেন পুলিসে খবর দেওয়া না হয়। জ্যোতি তাঁর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে ওঠে। মাঝরাতে দুর্ঘটনা। তারপর

॥ ৫ ॥

প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি চন্দ্রভানু-বাবু। প্রায় পনেরো দিন পর তিনি চোখ মেললেন। দেখলেন সামনে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর বুঝতে পারলেন, যে দাঁড়িয়ে আছে সে একজন নার্স। অন্তত নার্সের পোশাক দেখে সেই ধারণাই তাঁর হল।

নার্স নিজেই মুখ নিচু করে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন?"

তাঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু তিনি অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টার পর বললেন, "আমি কোথায়?"

নার্সটি বললে, "আপনি হাসপাতালে রয়ে-ছেন। আপনার কোনও ভয় নেই, আপনি ভাল হয়ে যাবেন।"

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কী হয়েছিল?"

নার্স বললে, "আপনি যে-ট্রেনে আসছিলেন সেই ট্রেনেই অ্যাকসিডেন্ট হয়। তখন অনেক রাত। ভোরের দিকে রিলিফ-ট্রেনে করে আপনাকে নিয়ে আসা হয় এই হাসপাতালে।"

চন্দ্রভানুবাবু একটা হাত দিয়ে নিজের মুখে হাত দিতে গেলেন, কিন্তু হাত নাড়তে পারলেন না।

জিজ্ঞেস করলেন, "হাত নাড়াতে পারছি না কেন?"

হাত নাড়তে চেষ্টা করবার সঙ্গে সঙ্গে নার্স হাতটা ধরে ফেললে। বললে, "হাত নাড়াতে চেষ্টা করবেন না। আপনার হাত-পা সব বাঁধা আছে।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "কিন্তু আমার চোখটা যে চুলকোচ্ছে—"

নার্স বললে, "তা একটু চুলকোবে। আপনার একটা চোখে খুব চোট লেগেছে, তাই ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে।"

"তা হলে কি আমি অন্ধ হয়ে যাব?"

"অত ভয় পাবেন না। আমরা এখানে আপনার চিকিৎসা করছি। ডাক্তার সব কিছু দেখছেন।"

"আমার ব্যান্ডেজ কবে খুলবেন?"

নার্স বললে, "সে আমি বলতে পারব না। ডাক্তারবাবু যখন ভাল বুঝবেন তখন খুলে দেবেন। আমি তো নার্স, আমি কিছু বলতে পারব না।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমাকে কতদিন এখানে এই রকম করে শুয়ে থাকতে হবে?"

"তা বলতে পারব না। সে ডাক্তারবাবু জানেন। আমরা দুজন নার্স আজ পনেরো দিন ধরে পালা করে আপনার পাশে ডিউটি দিচ্ছি। আপনি তো আজ পনেরো দিন ধরে অজ্ঞান ছিলেন।"

"পনেরো দিন?"

নার্স বললে, "হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু রোজ আসছেন আর আপনাদের দেখে যাচ্ছেন।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমরা কতদিন হাসপাতালে আছি?"

নার্স বললে, "প্রায় তিনশো লোক চোট খেয়েছে। আর দেড়শো লোক মারা গেছে। এ হাসপাতালে তো অত লোকের জায়গা নেই। ভাগ ভাগ করে অনেক লোককে অনেক হাস-পাতালে পাঠানো হয়েছে। ড্রাইভার খালাসি সবাই মারা গেছে।"

"কী করে অ্যাকসিডেন্ট হল?"

নার্স বললে, "আপনি বেশি কথা বলবেন না। ডাক্তারবাবু বারণ করে দিয়ে গেছেন।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কোথায় গেলেন? তাঁরা কি বেঁচে আছেন?"

নার্স বললে, "তা বলতে পারব না। কে কোন্ গাড়িতে ছিল তার হিসেব আমার খাতায় লেখা নেই। আমরা তো কেউ সেখানে ছিলুম না। কাকে কোথায় রাখা হয়েছে, কোন্

হাসপাতালে কার চিকিৎসা হচ্ছে, আমরা কিছুই জানি না। আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন—"

চন্দ্রভানুবাবু মনে মনে ভাবতে লাগলেন। পনেরো দিন তিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন! আশ্চর্য, তিনি তো বেঁচে আছেন! কিন্তু জ্যোতিষ্ক? জ্যোতিষ্ক কোথায়? সেও কি দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে?

জিজ্ঞেস করলেন, "সিস্টার, একটা কথা।"

নার্স বললে, "না, আর কোনও কথা নয়. আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। ডাক্তারবাবু যদি হঠাৎ এসে পড়ে দেখেন যে আপনি এত কথা বলছেন তাহলে তিনি আমাকে খুব বকাবকি করবেন?"

কিন্তু তবু তিনি শুনলেন না। বললেন, "আমার একটা কথার শুধু জবাব দিন সিস্টার। আমার সঙ্গে একটি ছেলে ছিল, তার বয়েস কম—এই ধরুন পাঁচ কি ছ-সাত বছর। সে বেঁচে আছে কি না আপনি কি বলতে পারেন?"

নার্স বললে, "আমি তো আগেই বলেছি সকলকে এক হাসপাতালে রাখা হয়নি।"

বহুদিন আগের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। ইচ্ছে বাইরে একটু পায়চারি করবেন। রাস্তায় বেরিয়েছেন এমন সময়ে একজন সাধু তাঁকে দেখে তাঁর সামনেই থমকে দাঁড়াল। তাঁকে দেখে সাধুটা বললে, "খোকাবাবু, তুমি রাজা হবে।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমি তো রাজারই ছেলে। আমার বাবা তো রাজার মতোই বড়লোক। আমাদের বাড়িতে রাজবাড়ির মতো হাতি আছে, উট আছে। আমাদের অনেক প্রজা, তারা আমার বাবাকে নজরানা দেয়।"

সাধু বললে, "এখন আছে, কিন্তু পরে কিছুই থাকবে না।"

সেদিন কোনও কথাই বিশ্বাস হয়নি চন্দ্রভানুবাবুর। তখন তিনি রাজার ছেলে। তাঁকে দেখবার জন্যে কত চাকর থাকত। তারা চন্দ্রভানুবাবুকে ঘিরে থাকত সবসময়ে। একজন স্নান করিয়ে দিত, একজন গায়ে তেল মাখিয়ে দিত, একলা কেউ কোথাও তাঁকে বেরোতে দিত না। বাবার হুকুম ছিল খোকাকে যেন সবাই চোখে চোখে রাখে। সেই 'বুলবুল-চণ্ডী!' হ্যাঁ, তাঁর আবছা-আবছা মনে পড়তে লাগল নামটা। বুলবুলচণ্ডীর বাড়িতে তাঁর বাবা প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন, তাদের উপর অত্যাচারের প্রতিকার করতেন। লোকে তাঁকে 'রাজাবাবু' বলে ডাকত। তাঁদের বুলবুলচণ্ডীর বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। কালীপুজো হত। কালী-পুজোর সময়ে পঞ্চাশটা পাঁঠা বলি হত। রক্তে ভেসে যেত জায়গাটা। সে-দৃশ্যটা এখনও চোখ বুজলে তিনি দেখতে পান! তাই সেদিন সাধুর কথা তিনি অবিশ্বাস করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ছোটবেলায় বোধহয় সব ছেলেই বেপরোয়া হয়। পৃথিবীটাকে তখন তারা হাতের মুঠোয় পেতে চায়। তখন মনে হয় যেদিন থেকে তার জন্ম সেইদিন থেকেই এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। তার আগে কিছুই ছিল না। আর আরো মনে হয় এ পৃথিবীতে যা-কিছু ভোগ করবার জিনিস আছে সবই তার পাওয়া চাই। আর চন্দ্রভানুবাবুরও তা পাওয়া চাই। সত্যিই খুব বেয়াড়া ছিলেন তিনি।

একদিন এক চাষী এসে বাবার কাছে অভিযোগ করলে যে রাজাবাবুর ছোট ছেলে চন্দ্রভানু তার একটা ছাগল চুরি করে তাকে কেটে ফেলেছে।

রাজাবাবু সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন বাড়ির সব চাকরকে। তারা সবাই বললে তারা কিছু জানে না।

চন্দ্রভানুকেও ডাকলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এর ছাগল চুরি করেছ?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

"কেন চুরি করেছ?"

চন্দ্রভানুবাবু বলেছিলেন "আমার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই।"

বাবা রেগে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তুমি জানো না যে পরের জিনিস চুরি করা পাপ?"

চন্দ্রভানুবাবু এ-কথার কোনও জবাব দেননি। বাবা তাতে আরো রেগে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তুমি পাপ করেছ, তার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। দাও, নাকে খত দাও, এই এখান থেকে ওখান পর্যন্ত ওর সামনেই তুমি নাকে খত দাও।"

নাকে খত মানে তিনি জানতেন। নিচু হয়ে মেঝেতে নাক ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে সোজা সেই দেখিয়ে দেওয়া জায়গাটা পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে যাওয়া। এর চেয়ে চরম অপমান আর কিছু

নেই। বিশেষ করে আবার সেই যার ছাগল চুরি গিয়েছিল, তারই সামনে।

চন্দ্রভানুবাবু বাবার সে-হুকুম মানেননি। সোজা সেখান থেকে দৌড়ে রাজবাড়ির মহাল পেরিয়ে বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশি দূর পালাতে পারেননি। তার আগেই বাবার হুকুমে রাজবাড়ির পেয়াদারা তাঁকে ধরে ফেলেছিল।

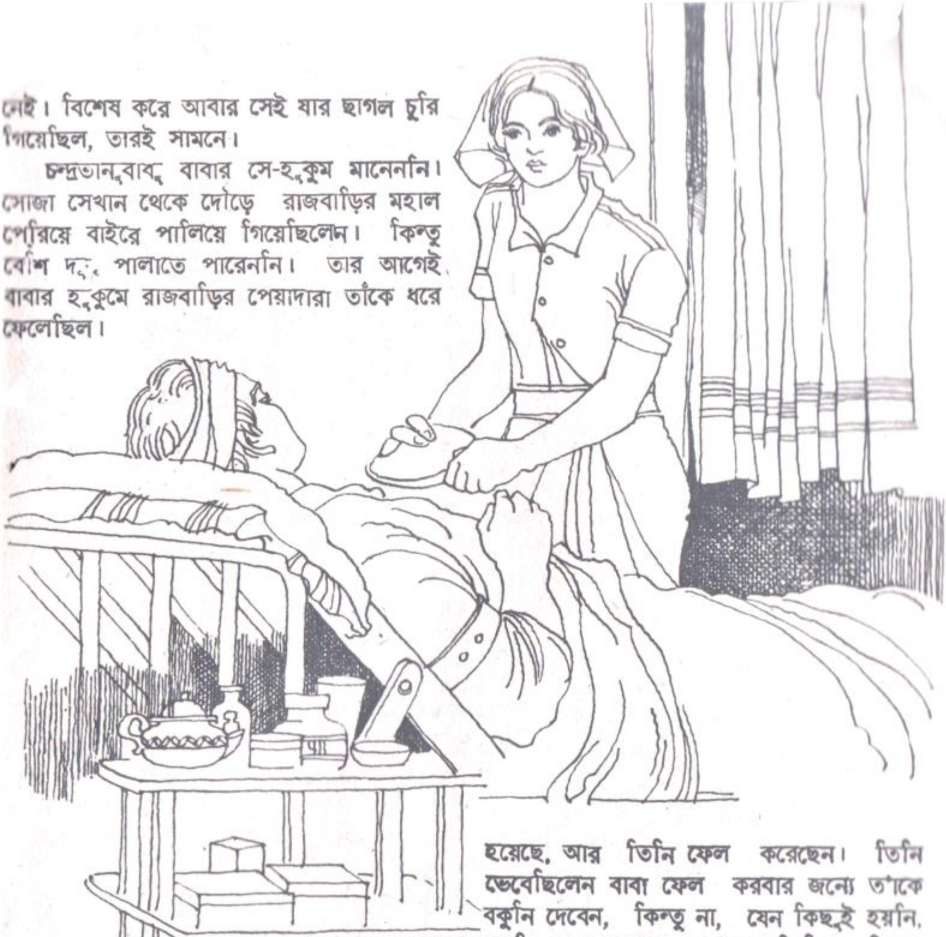

তারপর থেকে চন্দ্রভানুবাবুর ওপর থেকে বাবার সব স্নেহ-মমতা চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে বাবার সব ভালবাসা-স্নেহ-মমতা বড় ছেলের ওপরে গিয়েছিল। বাবা তাঁর দাদাকেই বেশি ভালবাসতেন।

বাবা প্রায়ই মা'কে বলতেন, "এ ছেলেটা আমার গোল্লায় যাবে!"

কী জানি কেন তখন থেকেই চন্দ্রভানুবাবু যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলেন। স্কুলের লেখা-পড়ার দিকেও আর তাঁর মন বসতে চাইত না। বাবার কাছে যেতেও মন চাইত না। বাবাও আর আগেকার মতো তেমন করে তাঁকে আদর করে কাছে ডাকতেন না। তাঁর দাদাকে নিয়েই থাকতেন তিনি।

পরের বছরে ক্লাসে যখন পরীক্ষার ফল বেরোল তখন দেখা গেল তাঁর দাদা ফার্স্ট হয়েছে, আর তিনি ফেল করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন বাবা ফেল করবার জন্যে তাঁকে বকুনি দেবেন, কিন্তু না, যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব দেখাতে লাগলেন তিনি। কিম্বা বাবা যেন ধরেই নিয়েছিলেন সে তো ফেল করবেই। সে যে অপদার্থ তা যেন তিনি আগে থেকেই জানতেন!

অথচ ক্লাসে ফার্স্ট হওয়ার জন্যে বাবা দাদার জন্যে উৎসবের আয়োজন করলেন। স্কুলের অনেক মাস্টারমশাইদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। আরো অনেকে নেমন্তন্ন খেতে এলেন। সেদিন সবার মুখেই ওই একই কথা—"আপনার বড় ছেলেটি বড় হয়ে খুব বড় হবে, দেখবেন রাজাবাবু। ওর মাথাটা খুব ভাল। যা পড়াই ও তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে। এই চন্দ্রভানুর মতন এত বোকা নয়।"

চন্দ্রভানুবাবু সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর কানেও কথাগুলো যাচ্ছিল। তাঁরা চন্দ্রভানুবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়েই কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি কথাগুলো শুনছিলেন আর

রাগে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু তখন ওই বয়েসে তাঁর করবারও কিছু ছিল না। তখন যদি তাঁর ক্ষমতা থাকত তো তিনি যেন তাঁদের সকলকে খুন করে ফেলতেন।

তারপর একদিন তিনি আরো বড় হলেন। তাঁর দাদা পরের বারও ক্লাসে ফার্স্ট হল, আর তিনি কোনওরকমে টায়েটোয়ে পাস করে ওপরের ক্লাসে উঠলেন।

হাসপাতালটার সেই কেবিনটার ভেতরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি তাঁর সেই ছোট বেলাকার কথাই ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কত কী করতে চেয়েছিলেন তিনি, আর কী হতে পেরেছেন সেই কথা ভাবতে গিয়েই তাঁর কান্না পেয়ে গেল। সব-কিছুই তো তিনি করতে পেরেছেন। তিনি যা হতে চেয়েছিলেন তা এখন তিনি হয়েছেন। এখন আর তাঁর বাবা বেঁচে নেই। তাঁর মা-ও মারা গেছেন। মালদা জেলার সেই বুলবুলচন্ডীর বিরাট জমিদারিও স্বাধীন দেশের সরকার কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু তিনিও তো অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। তাঁর মতো বড়লোক দেশে ক'জন আছে? তিনিও অনেক জমির মালিক এখন। বাবার যে বাড়ি ছিল বুলবুলচন্ডীতে তার চেয়েও বড় বাড়ি হয়েছে তাঁর। লোকে এখন তাঁকেও 'রাজাবাবু' বলে ডাকে। এখন তো তাঁর সেই বাবা নেই যে তাঁকে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য দেখাবেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তো তাঁকে তাঁর ঐশ্বর্য দেখিয়ে তিনি বলতে পারতেন, "এই দেখুন বাবা, আপনারা আর স্কুলের মাস্টারমশাইরা যা ভেবেছিলেন তা হয়নি। আমি গোল্লায় যাইনি।"

হঠাৎ একজন ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজকে কেমন আছে রোগী ?"

নার্স বললে, "ভালই আছেন।"

ডাক্তারবাবু রোগীর দিকে চেয়ে হঠাৎ চমকে উঠলেন, "এ কী, আপনি কাঁদছেন কেন?"

চন্দ্রভানুবাবু কিছু জবাব দেবার আগেই নার্স বললে, "বড্ড কথা বলছিলেন উনি, তাই আমি ওঁকে চুপ করে থাকতে বলেছি।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তা আপনি ওঁর চোখ মুছিয়ে দিতে পারেননি? দেখছেন উনি কাঁদছেন।" বলে নিজেই তোয়ালেটা দিয়ে চন্দ্রভানুবাবুর মুখটা মুছিয়ে দিতে লাগলেন। মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি কিছু কষ্ট হচ্ছে?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমি কি বাঁচব ডাক্তারবাবু?"

"নিশ্চয় বাঁচবেন।"

"কিন্তু আমার হাত-পা সব বেঁধে রেখেছেন কেন?"

"সে তো আপনাকে বাঁচাবার জন্যেই করেছি। আপনি আর কাঁদবেন না। কান্নার কী আছে?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমার যে কেবল সব পুরনো কথা মনে পড়ছে!"

ডাক্তারবাবু নার্সকে কী যেন বললেন। নার্স তাড়াতাড়ি কী-একটা এনে ডাক্তারবাবুর হাতে দিলে। তারপর চন্দ্রভানুবাবুর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর একটা হাতের খোলা জায়গাটায় ইনজেকশন দিয়ে দিলেন।

চন্দ্রভানুবাবু শুধু একবার মুখে 'উঃ' শব্দ করে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। অথচ আর তাঁর জ্ঞান নেই। মালদা, বুলবুলচন্ডী, মাস্টারমশাই—সব-কিছু বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেল। (ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

বৈজ্ঞানিকদের এক সভায় আইনস্টাইনও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। জগৎ-বিখ্যাত এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী সভায় বলছিলেন, এই অনন্ত মহাকাশ, এই সীমাহীন বিশ্বব্রহ্মান্ড, এর মধ্যে মানুষ তো একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ফুটকি মাত্র। শুনে আইনস্টাইন বললেন, সত্যি, আমারও প্রায়ই এরকম মনে হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবি, এই যে তুচ্ছ বিন্দুতুল্য মানুষ, সে-ই কিন্তু আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **সদাশিব** আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

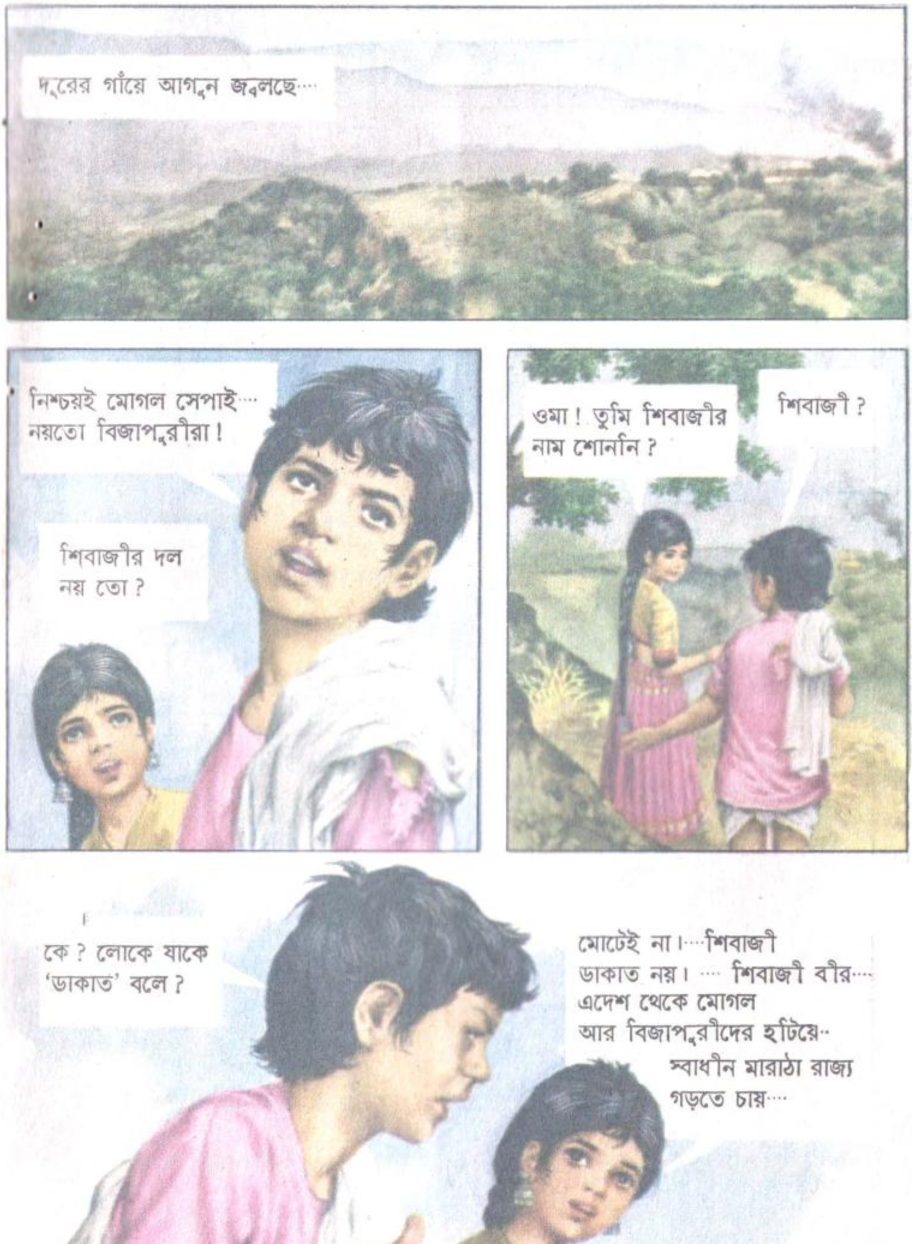

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

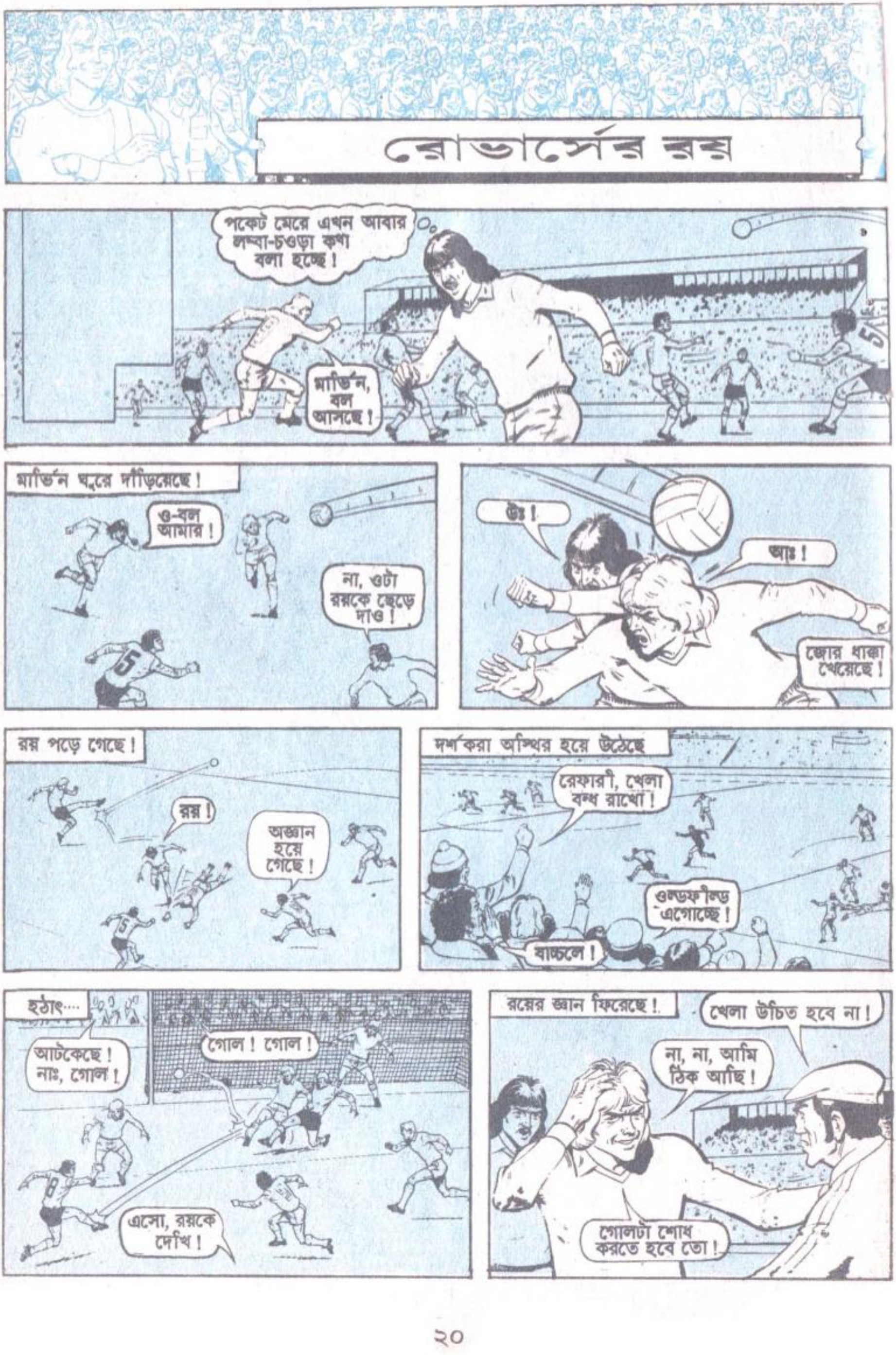
রোভার্সের রয়
পকেট মেরে এখন আবার লম্বা-চওড়া কথা বলা হচ্ছে!
মার্ভিন, বল আসছে!
মার্ভিন ঘুরে দাঁড়িয়েছে!
ও-বল আমার!
না, ওটা রয়কে ছেড়ে দাও!
উঃ!
আঃ!
জোর ধাক্কা খেয়েছে!
রয় পড়ে গেছে!
রয়!
অজ্ঞান হয়ে গেছে!
দর্শকরা অস্থির হয়ে উঠেছে
রেফারী, খেলা বন্ধ রাখো!
ওল্ডফীল্ড এগোচ্ছে!
যাচ্চলে!
হঠাৎ....
আটকেছে! নাঃ, গোল!
গোল! গোল!
এসো, রয়কে দেখি!
রয়ের জ্ঞান ফিরেছে!
খেলা উচিত হবে না!
না, না, আমি ঠিক আছি!
গোলটা শোধ করতে হবে তো!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

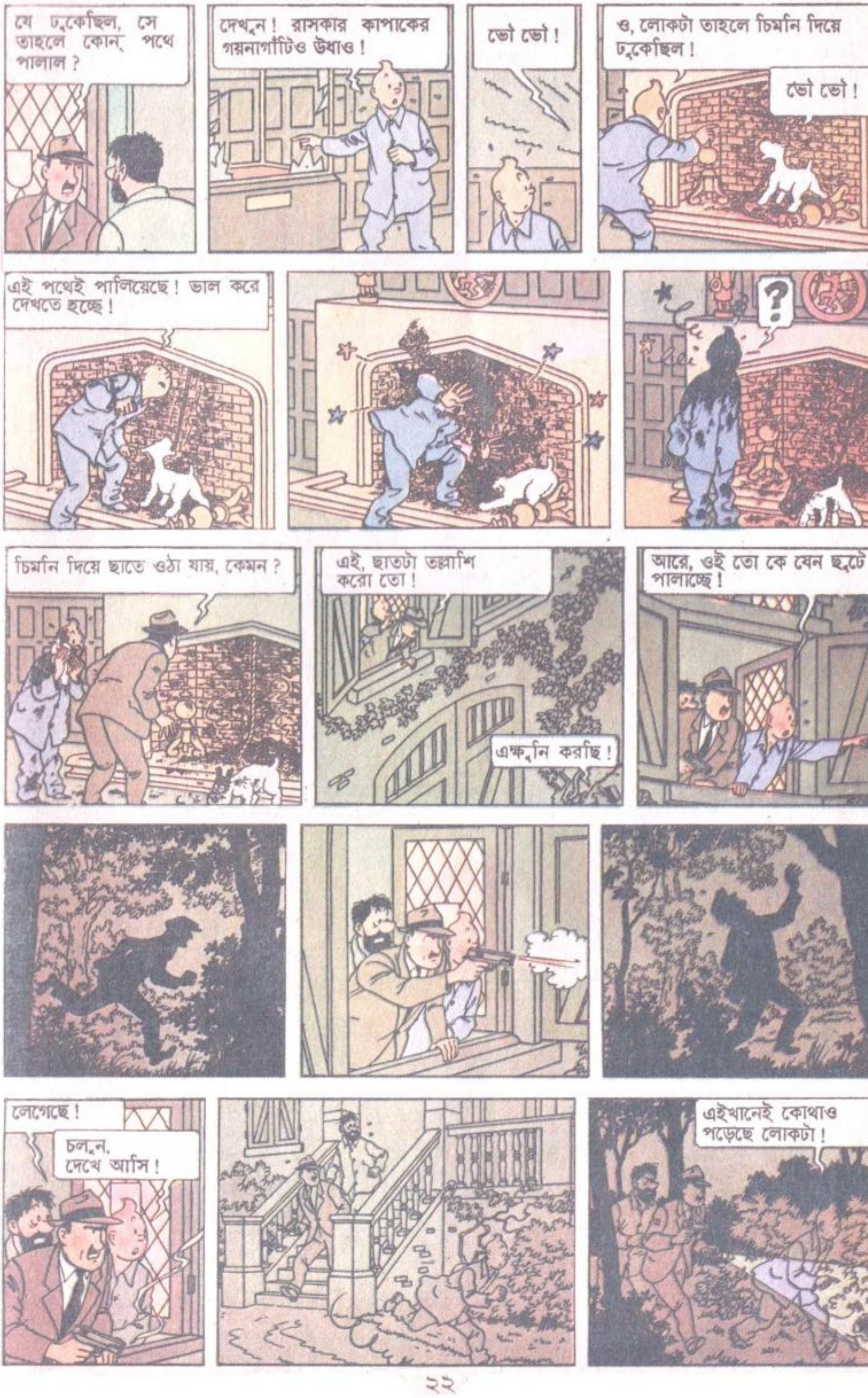

যে ঢুকেছিল, সে তাহলে কোন্ পথে পালাল ?
দেখুন ! রাসকার কাপাকের গয়নাগাঁটিও উধাও !
ভৌ ভৌ !
ও, লোকটা তাহলে চিমনি দিয়ে ঢুকেছিল !
ভৌ ভৌ !
এই পথেই পালিয়েছে ! ভাল করে দেখতে হচ্ছে !
চিমনি দিয়ে ছাতে ওঠা যায়, কেমন ?
এই, ছাতটা তল্লাশি করো তো !
এক্ষুনি করছি !
আরে, ওই তো কে যেন ছুটে পালাচ্ছে !
লেগেছে !
চলুন, দেখে আসি !
এইখানেই কোথাও পড়েছে লোকটা !

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

দুজনে মিলতে হবে

কুম্ভক

বেড়ালটা তো পালিয়ে গেল চারটে পা আস্ত রেখেই। তাই বলে উপমা যে সব সময়েই চারপেয়ে হবে, তেমন কিন্তু নয়।

বা, এই যে তুমি বললে উপমান উপমেয়. মতো আর লক্ষণ, এই চারটেই চাই!

বললাম। এখন আবার বলছি যে, এর থেকে একটু খসিয়ে নিলেও উপমাই থাকে সেটা।

কী-রকম?

নন্তু বলে উঠল : আচ্ছা, আমি বলছি। 'বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম, ফিরে মরীচিকা সম।' উপমাই তো হল এটা? মরীচিকার মতো বাসনা। অথচ মতো তো বলা হয়নি।

কে বলল? সম-টা তবে এল কোথা থেকে? বলেছিলাম না একদিন, মতোর মতো আরো অনেক শব্দ আছে?

টুম্পি হেসে বলল : মতোর মতো, বাঃ।

লজ্জা পেল নন্তু। বলল : তাও তো কথা। সেই যে হেন নিভ যথা সম, এইসব, না? এসব কি আজকাল বলে কেউ?

তা অবশ্য বলে না। তবে ভাষা তো কেবল আজকালেরই নয়। পুরনো দিনে আরো কত ছিল ও-রকম। প্রায় পারা তুল্য কল্প বৎ।

বৎ? সেটা কী?—প্রশ্ন করে টুম্পি।

বাঃ, সে তো জলবৎ তরল!

ও আচ্ছা! এর সবগুলো দিয়েই কবিতা বলতে পারো কাকু?

এই রে, তবে তো একটু ভাবতে হয়। নন্তুও একটু সাহায্য করবি নাকি? যেমন ধর্‌—যেমন ধর—আচ্ছা, সত্যেন দত্তের 'দূরের পাল্লা'য় আছে 'কেবল তারা! কেবল তারা! শেষের শিরে মানিক পারা।'

শেষের শিরেটা কী ব্যাপার?

শেষনাগ, অনন্তনাগ। সাপের মাথায় মণির মতো, অন্ধকারে তারা জ্বলছে। কিংবা 'আলেয়াহেন ডাকপেয়াদা, একলা ছোটে বনবাদাড়ে।' রানার ছুটছে আলেয়ার মতো।

সুকান্তর?

না, এ হল সত্যেন দত্তের রানার।

নন্তু হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলল নজরুল থেকে : 'কেঁদে ছুটে আমি পাগলের প্রায়, স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়।' কেমন? হল? কিন্তু বৎ দিয়ে বলতে পারবে না কিছু।

পারব না? মনে নেই রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজীউৎসব'? 'তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ, এসেছিল নামি।' কপাল যেন আকাশ, সেখানে ভাবনা খেলে গেল বিদ্যুতের মতো। কিন্তু নন্তু, আসল কথাটা থেকে সরে এসেছি আমরা।

কী ছিল আসল কথা?

তোর ওই মরীচিকার লাইনটাতে উপমার একটা পা সত্যিই নেই। কোন্‌টা বল তো? নেই মিলের লক্ষণটা। বাসনার সঙ্গে মরীচিকাকে যে মেলাচ্ছ, কী মিল দেখে মেলাচ্ছ? দুটোর কোনোটাকেই ধরা যায় না শেষ পর্যন্ত, কেবলই ভোলায়, এই তো? এটাই হল মূল ব্যাপার, আর এইটেকেই রাখা হল ঢেকে। বেশির ভাগ সময়ে এইরকমই হয়। কেন হয় জানিস টুম্পি?

কেন?

ওইটুকু ছেড়ে রাখা হল, যে শুনছে তার কল্পনাকে উশকে দেবার জন্য। এই হল ডুবোপাহাড়ের প্রথম ডুব। সবটাই কেন দেখিয়ে দেব? সবটাই কেন বলে দেব? 'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে।' যে শুনেছে, সেও তার মন নিয়ে এগিয়ে গেল কথাটার দিকে। আবিষ্কার করবার, বুঝে নেবার আনন্দ হল তার।

অত আনন্দে কাজ নেই আমার। কবি যদি নিজেই আরেকটু খাটেন, খুলেই বলেন যদি আমাদের পক্ষে সেটাই ভাল রে টুম্পি।

(ক্রমশ)

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
গুহাবাসী একদল মানুষ ও এক দঙ্গল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী চলেছে পেলুসিডারের চাঁদের তলার অন্ধকার রাজ্যের দিকে····
আমাদের মাথায় ওটা ভেঙে পড়বে না তো?
না, রেনা ভয় নেই! কিন্তু কী আছে ওই গোলকে? হ্রদ আর পাহাড়?
বন্দী সাগোথ বলছে, রানী ডায়ানকে তারা সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের তলায় নিয়ে যাচ্ছিল!
কিন্তু ওই অন্ধকারের মধ্যে আমরা যাব কী করে?
তাহলে তুমি থাকো, আমি বরং সৈন্যদের নিয়ে টারজান আর রানীকে ওখানে খুঁজতে যাই।
না, না, আমি জেন কুয়া। আমি যাব।
অন্ধকারে ঢোকার জন্যে তৈরি হও!
হরিবরাও সঙ্গে চলো। নইলে তোমাদের বন্দী নেতাকে····
মেরে ফেলব।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও সৈন্যদল অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে!
গার্ট, বন্দীকে জিজ্ঞেস করো, আমরা ঠিক-পথে এগোচ্ছি কি না।
জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, জেন কুয়া! বন্দী মারা গেছে!
ওভাবে ওকে ঝুলিয়ে রাখা ঠিক হয়নি!
চুপ করো, ভন হর্স্ট!
সৈন্যদল, যাও, টারজান ও রানীকে খোঁজো

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[আগে যা ঘটেছে : সন্তু আর কাকাবাবু এবার অভিযানে এসেছে হিমালয়ে। গোরখশেপ নামে একটা জায়গায় একটা গম্বুজের মধ্যে ওরা থাকে, আর সামনে কয়েকটা তাঁবুতে দুজন শেরপা আর মালবাহকরা। দূরে দেখা যায় এভারেস্টের চূড়া। কাকাবাবু সঙ্গে একটা কাচের বাক্সে একটা দাঁতের মতন জিনিস এনেছেন, যেটা মানুষের দাঁতের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বড়। কাকাবাবু রোজ রাত্তিরে গম্বুজের চূড়ায় চোখে দূরবিন লাগিয়ে বসে থাকেন। একদিন তিনি অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলেন কয়েকটা আলোর বিন্দু। সন্তুর ধারণা, সেগুলো ইয়েতি। কিন্তু কাকাবাবু বললেন, ইয়েতিরা আলো নিয়ে ঘুরবে কী করে? তারপর—]

৮

পরদিন সকালেই কাকাবাবু মিংমাকে ডেকে বললেন, "তাঁবু গোটাও। আমরা এবার সামনের দিকে এগোব।"

মিংমা যেন আনন্দে একেবারে নেচে উঠল। সে বলল, ''এভারেস্টে যাব, সাব ? চলিয়ে সাব, আমি আপনাকে কান্ধে পর উঠাকে নিয়ে যাব।''

কাকাবাবু বললেন, "তার দরকার হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব। আমাদের এক নম্বর ক্যাম্প হবে কালাপাথরে।''

মিংমা ছুটে বেরিয়ে গেল অন্যদের খবর দিতে।

কাকাবাবু প্যাকিং বাক্স খুলে বার করলেন একটা ওয়্যারলেস সেট। এটাও তিনি এবার বিদেশ থেকে এনেছেন। বিদ্যুৎ ছাড়াই এটা ব্যাটারিতে চলে।

যন্ত্রটাকে চালু করতেই সেটের মধ্যে কর-র-র কট কট শব্দ শুরু হল। কাকাবাবু বললেন, ''সন্তু, তুই একটু বাইরে যা।''

সন্তু গম্বুজের বাইরে চলে এল। কিন্তু মনে মনে খুব কৌতূহল রয়ে গেল তার। এই যন্ত্রটা কাকাবাবুকে আনতে সে দেখেছে, কিন্তু এর আগে কাকাবাবু ওটা একবারও ব্যবহার করেননি। কাকাবাবু কার সঙ্গে কথা বলছেন, আর এমন কী গোপন কথা, যা সন্তুর সামনে বলা যায় না ?

বাইরে এসে সন্তু দেখল, শেরপা আর মালবাহকরা এরই মধ্যে খটাখট শব্দে তাঁবুর দড়ি-বাঁধা খুঁটি তুলতে শুরু করেছে। সন্তুও ওদের সঙ্গে হাত লাগাল।

খানিক বাদে কাকাবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "যা সন্তু, এবার তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নে।"

মিংমা বলল, "ইধার সে খানা খা কে জায়গা ? তাতেই সুবিধা হোবে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, আকাশ পরিষ্কার আছে, তাড়াতাড়ি রওনা হলে দুপুরের মধ্যে কালাপাথর পৌঁছে যাব। সেখানে খানা পাকানো হবে।"

মিংমা এক গেলাস ধোঁয়া ওঠা চা কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "কম সে কম এক গিলাস তো চা খেয়ে লিন।"

সন্তু গম্বুজের দিকে যাচ্ছিল, মিংমা তাকেও ডেকে বলল, "আরে সন্তু সাব, তুম ভি থোড়া চায়ে পি লেও।''

এখানে ঠাণ্ডার মধ্যে যতবার চা খাওয়া যায় ততবারই ভাল লাগে। গরম গেলাসটা দু' হাত দিয়ে চেপে ধরলে আরাম লাগে খুব।

চা খেতে খেতে মিংমা জিজ্ঞেস করল, "আংকেল সাব, কালাপাথরমে তো আজই পহুঁছে যাব। সিখানে ফিন ক রোজ থাকব আমরা —''

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "সেখানে থাকব কেন? রাতটা কালাপাথরে ঘুমিয়ে আবার এগিয়ে যাব সামনের দিকে। এভারেস্টে যেতে হবে না ?''

মিংমা অবাকভাবে ভুরু তুলে বলল, "তব ইধারমে ইতনা রোজ কাঁহে ঠারা ? সাতদিন সিরফ চুপচাপ বৈঠে বৈঠে..."

কাকাবাবু বললেন, "এখানে থাকার দরকার ছিল। এত ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তাই শরীরটাকে সইয়ে নেওয়া হল।... আচ্ছা বলো তো, মিংমা, কালাপাথর থেকে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছতে কত দিন সময় লাগবে ?''

মিংমা বলল, "আকাশের দেওতা যদি কৃপা করেন তো সাত রোজ, আট রোজের মধ্যেই পঁহুছে যাব।''

সঞ্জু হল সর্বকালের দাদা
সবসময় ছোট বোনের পেছনে লাগে
আর চুলে টান মারে যতক্ষণ না বোনটি চেঁচিয়ে উঠে থামতে বলে
কিন্তু সে বোনকে ভালও বাসে
তার ভাঙ্গা খেলনা জুড়ে দেয়
তার বোনকে যে ক্ষেপায়, তাকে শাস্তি দেয়
সে যখন তার বোনের হাতে নিউট্রিন সুইটস্ গুঁজে দেয় তখন তার মুখের হাসি দেখতে ভালবাসে
ওগুলি খুবই সুস্বাদু-আর চমৎকার নানা রকমের পাওয়া যায়
আর ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে ফেলবার পর ভাবসাব করতে হাতের কাছেই মজুত।
nutrine
নিউট্রিন
চাকুম চাকুম খাসা মিষ্টি দিয়ে ঠাসা
CAS: NC: 35:79 BEN

সন্তু বলে উঠল, "মোটে সাত আট দিন লাগবে ?"

মিংমা বলল, "হাঁ সাব, উস সে জাদা দিন নেহি লাগে গা। সাউথ কল সে উঠ জায়েগা—তুম রহেগা হামারা সাথ।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। তা হলে তো আমাদের সঙ্গে খাবারদাবার যথেষ্টই আছে।"

মিংমা এর পর বিড় বিড় করে আপন মনেই যেন বলল, "আভি তক ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমরা কি সত্যিই এভারেস্টে উঠতে যাচ্ছি ?"

কাকাবাবু বেশ গলা চড়িয়ে বললেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না মানে ? আমি কি তোমাদের মিথ্যে কথা বলে এসেছি ? আমরা নিশ্চয়ই এভারেস্টে উঠব। চূড়ায় উঠতে পারলে এ দলের সবাই অনেক টাকা পুরস্কার পাবে। ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট, নেপাল গভর্নমেণ্ট দুই গভর্নমেণ্টই পুরস্কার দেবে। দলের প্রত্যেককে।"

মিংমা চট করে কাকাবাবুর খোঁড়া পা-টার দিকে একবার তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "কী রে সন্তু, জিনিসপত্র গুছোতে গেলি না ?"

সন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল গম্বুজের দিকে।

ভেতরে ঢুকে সে প্রথমে খুব চমকে গেল. ঘরের মাঝখানে একজন লোক উবু হয়ে বসে আছে।

তারপর দেখল, সেই লোকটি হচ্ছে দ্বিতীয় শেরপা নোরবু।

নোরবুর পক্ষে এই গম্বুজের মধ্যে ঢোকা আশ্চর্য কিছু না। কাকাবাবুর জিনিসপত্র বার করতে হবে। কিন্তু নোরবু কোনো জিনিসপত্র বার করার বদলে কাচের বাক্সটার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে বসে আছে স্থির হয়ে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী নোরবু ভাই ?"

নোরবু যেন চমকে গেল খানিকটা. তারপর সেই অবস্থায় বসে থেকেই মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সন্তু সাব, ইয়ে কেয়া হ্যায়।"

সন্তু বলল, "ইয়ে দাঁত হ্যায়। একঠো দাঁত।"

নোরবু বলল, "কিসকা দাঁত ?"

সন্তু বলে ফেলতে যাচ্ছিল যে, ইয়েতির দাঁত ওটা। কিন্তু সামলে নিল, এরা সবাই ইয়েতির নামেই ভয় পায়। মিংমা বলেছিল, ইয়েতির কথা শুনলেই মালবাহকেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। কাকাবাবুও এই কাচের বাক্সটা ওদের সামনে কক্ষনো বার করেন না।

সে বলল, "মালুম নেহি।"

নোরবু তবুও জিজ্ঞেস করল, "মানুষ কা দাঁত ইতনা বড়া নেহি হোতা হ্যায়। কিসকা দাঁত হ্যায় এঠো ?"

নোরবু অন্য সময় প্রায় কথাই বলে না। খুব গম্ভীর। তাকে এত কথা বলতে দেখে সন্তু বেশ অবাক হল।

নোরবু বাক্সটা খুলে দাঁতটা বার করতে গেল। সন্তু অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠে বলল, "আরে আরে, খুলো না, খুলো না।"

নোরবু বেশ রুক্ষভাবে বলল, "কাহে ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু বারণ করেছেন। ওটায় কারুর হাত দেওয়া নিষেধ।"

নোরবু বলল, "হাম চিজ তো দেখে গা।"

সন্তু এবার ধমক দিয়ে বলল, "বারণ করছি না, ওটায় হাত দিলে কাকাবাবু রাগ করবেন। নোরবু ভাই, তুমি এই প্যাকিং বাক্সটা বাইরে নিয়ে যাও বরং।"

নোরবু সে কথায় কান না দিয়ে কাচের বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। নোরবুর এরকম ব্যবহার দেখে হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল সন্তুর। সে এক্ষুনি গম্বুজের বাইরে গিয়ে কাকাবাবুকে ডেকে আনতে পারে। কাকাবাবু তাকে সব সময় এই বাক্সটা চোখে চোখে রাখতে বলেছেন।

কিন্তু সে কাকাবাবুকে ডাকল না, নোরবুর সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে বলল, "কী হচ্ছে কী ? এই বাক্সটায় হাত দিতে বারণ করছি না ?"

নোরবু যেন কেমন হয়ে গেছে। চোখ দুটো ঘোলাটে মতন। সে সন্তুকে এক ধাক্কায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সন্তু ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, সেই অবস্থাতেই সে ক্যারাটের প্যাঁচে নোরবুর চোয়ালে কষাল এক লাথি।

সন্তুর চেয়ে নোরবু অনেক বেশি জোয়ান, তবু সেই আঘাতেই সে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

অমনি সন্তুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল "এই রে।"

সন্তু ভয় পেয়ে গেছে। নোরবুর হাত থেকে

ছিটকে কাচের বাক্সটাও পড়ে গেছে মাটিতে। নিশ্চয়ই ভেঙে চুরমার।

কিন্তু বাক্সটা ভাঙেনি। মাটিতে পড়ে সেটা সামান্য একটু লাফিয়ে উঠল। সেটা আসলে কাচের নয়! খুব সূক্ষ্ম প্ল্যাস্টিকের মতন জিনিসে তৈরি, ঠিক কাচের মতন দেখায়।

মাটিতে পড়ে নোরবু একেবারে হতভম্ব। সন্তুর মতন একটা বাচ্চা ছেলে প্যাঁচ কষিয়ে তাকে ফেলে দিল! সে আবার উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্তুর ওপর, সন্তু ঠিক সময় সরে গেল তার তলা থেকে। নোরবু আবার মাটিতে আছড়ে পড়ল। গায়ে জোর থাকলেও নোরবু লড়াইয়ের কোনো নিয়ম জানে না।

নোরবু আবার উঠে দাঁড়াবার আগেই কাকাবাবু ঢুকলেন ভেতরে। নোরবুকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন, "কী হল?"

নোরবু কোনো উত্তর দিল না।

সন্তু দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। নোরবু যে হঠাৎ এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করতে শুরু করেছে, সে কথা শুনলে কাকাবাবু নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন। ওকে কোনো কঠিন শাস্তিও দিতে পারেন। এমনকী নোরবুকে হয়তো আর অভিযানে সঙ্গে নেবেনই না।

সন্তু বলল, "কিচ্ছু হয়নি। ও এমনি পা পিছলে পড়ে গেছে।"

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাচের বাক্সটা নিয়ে কী করছিস?"

"এটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"না, ওটা আমার কাছে থাকবে। নোরবু, তুমি লোকজনকে ডেকে এ ঘরের মালপত্র বার করার ব্যবস্থা করো।"

নোরবু কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

ঠিক সকাল ন'টার সময় যাত্রা শুরু হল।

সন্তু এর আগে কালাপাথরের ওপরে উঠেছিল একবার। খুব বেশি দূর নয়। যদি তুষারপাত শুরু না হয়, তাহলে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

মিংমা আর নোরবু চলেছে একেবারে সামনে। তাদের পেছনে সন্তু। মিংমা তার স্বভাব অনুযায়ী নানারকম মজার কথা বলতে বলতে চলেছে। নোরবু গম্ভীর। সে অন্য সময়ও এরকম গম্ভীর থাকে, কিন্তু আজ তার মুখখানাই যেন বদলে গেছে। সন্তু মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখছে নোরবুকে। কিন্তু নোরবু একবারও তাকাচ্ছে না তার দিকে।

বরফের ওপর দিয়ে পা টেনে টেনে চলা। কিছুতেই খুব জোরে যাওয়া যায় না। সকলেরই সঙ্গে কিছু কিছু মালপত্র। এমন কী কাকাবাবুরও পিঠের সঙ্গে একটা ব্যাগ বাঁধা। কালাপাথরের ওপরে উঠলে এভারেস্ট চূড়া একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়। এভারেস্ট। সত্যিই কি এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা হবে? এত ছোট একটা দল নিয়ে? কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে এভারেস্টে উঠবেন? সন্তু কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

ঘণ্টা খানেক একটানা চলার পর কাকাবাবু দূর থেকে সন্তুর নাম ধরে ডাকলেন।

সন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কাকাবাবু একেবারে পিছিয়ে পড়েছেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি আবার চেঁচিয়ে বললেন, "সন্তু, আমার ওষুধ—।"

কাকাবাবুকে কয়েকটা ওষুধের ট্যাবলেট খেতে হয় দিনে তিনবার। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পকেট থেকে ট্যাবলেটের কৌটো বার করতে তাঁর অসুবিধে হয় বলে সন্তু তখন সাহায্য করে কাকাবাবুকে। কিন্তু এখন তো ওষুধ খাবার সময় নয়। কাকাবাবু নিশ্চয়ই হাঁফিয়ে পড়েছেন!

সন্তু কাকাবাবুর কাছে ফিরে এল।

কাকাবাবু তাঁর কোটের ডান পকেটটা দেখিয়ে বললেন, "ওখান থেকে ওষুধ বার কর।"

"আপনার কষ্ট হচ্ছে, কাকাবাবু?"

"কিচ্ছু না। শোন্। গম্বুজের চূড়া থেকে রাত্তিরবেলা যে আলোর বিন্দু দেখেছিলাম, তা কতটা দূরে ছিল বলে তোর মনে হয়?"

"ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"আমার আন্দাজ এই রকম জায়গা থেকে।"

সন্তু চারদিকটা দেখল।

কাকাবাবু একটা ট্যাবলেট মুখে ফেলে বললেন, "তুই অন্যদের নিয়ে এগিয়ে যা। কারুর থামবার দরকার নেই। ওদের বলবি, আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। আমি এই জায়গাটা খানিকটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

(ক্রমশ)

সন্তুদের কাকাতুয়া

আশিস ঘোষ

সন্তুদের বাড়িতে একটা কাকাতুয়া আছে। কাঠের বড় খাঁচায় কাকাতুয়াটা থাকে। সন্তুরা কেউ খাঁচার সামনে দাঁড়ালেই কাকাতুয়ার মাথার ঝুঁটি ফুলে ওঠে। কত কথাই না বলে পাখিটা!

সন্তুদের মাসতুতো ভাই মন্টু আজ বেড়াতে এসেছে। ওকে নিয়ে ওরা সবাই ছাদে এসেছে কাকাতুয়া দেখাতে। কে জানত এমনটা হবে! মন্টু খাঁচার পাল্লা খুলে দিয়েছিল। অতটা ঠিক বুঝতে পারেনি। ছাদের অন্যদিকে সবাই খেলছিল। সবাই মানে সন্তু-ডলি-মিনু —এরা। প্রত্যেকেই খেলায় ব্যস্ত। কাকাতুয়াটা হঠাৎ উড়ে গিয়ে ছাদের কার্নিসে বসল।

প্রথমে ডলিই দেখাল, "ঐ দ্যাখ!"

তাই তো, পাখিটা কখন যে বেরিয়ে এসেছে, কেউ খেয়াল করেনি। কার্নিসে বসে পাখিটা ঘাড় বেঁকিয়ে ওদের দিকেই চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে ডাকতে গেল সন্তু। পেছন থেকে ডলিরা হৈ-চৈ করে উঠল। কাকাতুয়া কী ভাবল কে জানে। উড়ে গিয়ে রাস্তার ধারের দেবদারু গাছে বসল। ওরা অনেক ডাকাডাকি করল। কে শোনে! কাকাতুয়া উড়ে চলল। এ-বাড়ির ছাদে ও-বাড়ির কার্নিসে। রাস্তার লাইটপোস্টে কিংবা দেবদারু গাছে। তারপর সোজা পার্কের দিকে।

দুদ্দাড় করে সন্তুরা নীচে ছুটল। সোজা রাস্তায়। ছুট-ছুট-ছুট। পার্কের দিকে গেল সবাই। পার্কটা খুব বড় নয়। তবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেশ কয়েকটা বড় বড় গাছ আছে। বাচ্চা একটা ছেলে কুকুর নিয়ে খেলছে। কে যেন বেঞ্চিতে বসে।

ছুটতে ছুটতে সন্তুরা সব পার্কে ঢুকে পড়ল। চারদিকে খুঁজল। কোথায় গেল কাকাতুয়া? পার্কের পেছন দিকে পর পর কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। সবুজ ঘাসে লাল ফুল ছড়িয়ে আছে। ওদের পায়ের শব্দে ছোট্ট একটা কাঠবেড়ালি ছুটে সামনের গাছটাতেই উঠে গেল। ওকে দেখতে গিয়েই কাকাতুয়াটা নজরে পড়ল। সবুজ পাতার ফাঁকে চুপচাপ বসে আছে। কয়েকটা কাক উড়ছে। ও কি নীচের দিকেই চেয়ে আছে? ঢিল ছুঁড়ল সন্তু। ডলি মিনুরাও ছুঁড়ল। অত ওপরে কি যায়? একটাও লাগল না কাকাতুয়ার গায়ে।

কক্ - কক্ - কক্—ডাকছে পাখিটা। বেঞ্চিতে বসে থাকা লোকটা উঠে এল। বাচ্চা ছেলেটাও কুকুর নিয়ে ছুটে এল। সবাই ওপর দিকে চেয়ে।

"এই খোকা," হাত নেড়ে সন্তুকে ডাকে লোকটা। "পাখিটা তোমাদের?"

মাথা নাড়ে সন্তু।

"পালাল কী করে?"

"খাঁচার দরজা খোলা ছিল।" হাত নেড়ে বোঝাতে চায় সন্তু।

লোকটা আর কিছু বলল না। ওপর দিকে চেয়ে মুখে আঙুল পুরে খুব জোরে শিস দিল কয়েকবার। কুকুরটাও ঘেউ ঘেউ করল। ব্যস। কাকাতুয়া আবার উড়ল। এ-গাছ থেকে ও-গাছে। কিছুতেই এক জায়গায় বসে না।

Imageads-NP-1m

কী আর করে! সন্তুরা বোকার মতো ওপর দিকেই চেয়ে রইল। ওদের মা বাবা, পাড়ার আরও অনেকেই এসে পড়েছে। হৈ-চৈ কাণ্ড!

পার্কের একেবারে ডান দিকে যে লম্বা তাল গাছটা আছে, কাকাতুয়া এখন সেই গাছে। মাথা দুলিয়ে নীচের দিকে চাইছে। অনেক ডাকাডাকি করা হল। কাঁচা ছোলা, লাল আপেল, পাকা আম কত কিছুই না আনা হল। দুষ্টু পাখিটার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

বেলা বাড়ছে। শীতের দিন এমনিতেই ছোট। সন্তুদের তো স্কুলে যাওয়াই হল না। যারা ভিড় করেছিল, তারা চলে গেছে। কতক্ষণ আর থাকা যায়? কাজকম্ম আছে তো! সন্তুরাও বাড়ি ফিরল। ফিরতে কি চায়? অনেক বুঝিয়ে তবে ওদের ফিরিয়ে আনা হল। কতবার যে ছাদে উঠে ওরা খাঁচাটা দেখল, তার ঠিক নেই। ধ্যুত, কিছুই ভাল লাগছে না। মণ্টু বেচারি সারাদিন গোমড়া মুখে খাঁচার সামনেই বসে রইল। বিকেলের দিকে সন্তুরা একবার পার্কে গেল। কাকাতুয়া কৃষ্ণচূড়ার ডালেই বসে আছে। একবারও ডাকল না। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল।—বেচারা!

ডলি তো প্রায় কাঁদো-কাঁদো। "দাদাভাই রাতে ওর শীত করবে না?"

মাথা নেড়ে সন্তু বলল, "ওদের শীত করে না।"

"কেন?"

"মা বলেছে।"

মুখে যাই বলুক, সন্তুরও মন খারাপ। মিনু তো কোনো কথাই বলছে না। রাতে সবাই আরাম করে শুয়ে থাকবে, আর ও বেচারা সারা রাত বাইরের ঠাণ্ডায় থাকবে। সন্তুরা ভেবেছিল, অন্ধকার হওয়ার আগেই কাকাতুয়া হয়তো ফিরে আসবে। কিন্তু কই? অন্ধকার হয়ে গেল, কাকাতুয়া এল না।

সন্তুরা ছাদে গিয়ে অপেক্ষা করল। খাঁচার দরজা খোলাই ছিল। অন্যদিন এ সময়ে কাকাতুয়া দাঁড়ে বসে থাকত। বিকেলে সন্তুরা যখন ছাদে ছুটোছুটি করত, কাকাতুয়া দাঁড়ে এক পা তুলে নাচত। খাঁচার মধ্যে উড়ত। কক্-কক্ ডাকত পাখিটা। কেউ হাততালি দিলে, মাথার ঝুঁটি তুলে তাকাত। খাঁচা আজ শূন্য। কোনো শব্দই নেই।

রাতে আর ঘুম আসে না।

কতবার সন্তু জানলার সামনে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নায় সব-কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেবদারুর পাতা হাওয়ায় কাঁপছে। রাস্তায় কেউ নেই। কিছু নেই। দূর থেকে যেন শব্দ আসছে—কক্-কক্-কক। শব্দটা শুনতে-শুনতে সন্তু ঘুমিয়ে পড়ল।

"সন্তু—এই সন্তু—" জানলায় বসে কাকাতুয়া ডাকছে।

সন্তু চেয়ে রইল।

"আমি এসেছি!"

কী বলবে, ভেবে ঠিক করতে পারে না সন্তু।

"তোমাদের খাঁচায় আর ঢুকব না—"

"কোথায় যাবে?"

"দূরে—অনেক দূরে—সেই নীল পাহাড়ের দেশে—"

"আর ফিরবে না?"

"কী যে বলো!"

"আচ্ছা ভাই কাকাতুয়া, সেখানে কী আছে?"

"কী নেই বলো? নীল পাহাড়—সবুজ নদী, লাল-হলুদ ফুল—ছোট ছোট সবুজ বাড়ি!"

"আমাকে নিয়ে যাবে?"

কক-কক করে হেসে উঠল কাকাতুয়া।

"ওখানে কারা থাকে?"

"শুধু আমরা।" ডানা ঝাপটাল কাকাতুয়া। "চলি ভাই—দেরি হয়ে যাচ্ছে—"

কাকাতুয়া চলে গেল। সাদা একটা পালক উড়ে এল। একেবারে বিছানায়—সন্তুর গায়ে।

ঘুম ভেঙে যায় সন্তুর। সকাল হয়ে গেছে। ডলি-মিনু-মণ্টুদের এখনো ঘুম ভাঙেনি। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামে সন্তু। তাই তো! জানলার নীচে সাদা একটা পালক পড়ে আছে। পালকটা তুলে, গায়ে মুখে একবার বুলিয়ে নেয় সন্তু। তারপর ছাদে ছুটে যায়।

এ কী! খাঁচার মধ্যেই কাকাতুয়া বসে আছে। সন্তুকে দেখেই ডানা ঝাপটে উঠল। কককক। সাদা পালক উড়ল কয়েকটা। উড়তে উড়তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পালক কুড়োতে কুড়োতে সন্তু ভাবল,—কাকাতুয়া কি সেই নীল পাহাড়ের দেশ থেকেই ঘুরে এল?

ছবি অনুপ রায়

১		২		৩		৪
৫				৬		
৭		৮		৯		১০
১১				১২		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) এক রাজর্ষির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে নদীর এই নাম। (৩) কথাবার্তা আর গানের সুর ভাঁজা একই শব্দে বোঝানো যেতে পারে। (৫) থাল। (৬) চাঁদ, বিখ্যাত এক ঐতিহাসিক রাজাও। (৭) নূপুর। (৯) বিখ্যাত উপকথাকার। (১১) পৃথিবীতেও স্বর্গ আছে নাকি, জায়গাটির তো সেইরকমই পরিচয়। (১২) ফুল, শুকিয়ে গেলে দামি মসলা।

উপর-নীচ : (১) সূর্যোদয়ের দেশ। (২) ইঁদুর-বর্গীয় উভচর প্রাণী, পশ্চিম গোলার্ধের একটি মহাদেশেই শুধু পাওয়া যায়। (৩) মহাশূন্য। (৪) অববাহিকা, অন্য অর্থে খাট। (৭) পালকি। (৮) বরফ। (৯) বিখ্যাত পাখি। (১০) যে-পোকা উড়তে পারে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

বা	লু	শা	ই			
মা	ই	ল		প		গো
	পা			ন	হ	লা
মা	স্তু	ল		স	র্ষ	প
তু	র	গ			ব	
ল		ন		নি	র্ধ	ন
			শ	ব	ন	ম

ঠিক যে কিছু চুরি হয়েছে তা নয়, তবে চোর ঢুকেছিল ঠিকই, কিছু নিয়ে যেতে পারেনি।

পাশের বাড়ির নবীন এসে ছোটকাকে খবরটা দিল। ঘটনাটা ঘটেছে ওদের বাড়িতে আগের দিন সন্ধেবেলা। লোডশেডিংয়ের মধ্যে।

বাড়িতে তখন ছিল নবীন, নবীনের সেজ - কাকিমা ইতি বসু, সেজকাকা সরল বসু, আর ছিল হরিমতি, নবীনদের বাড়িতে যে কাজকর্ম করে।

দরজা খোলা পেয়ে ঢুকেছিল চোর, সামনের দিকে প্রথম ঘরটার তালা ভাঙবার চেষ্টা করেছিল। তালা টানাটানির শব্দ পাওয়া

থেকে বার করতে হবে চোর যখন ঢুকেছে তখন কে কোন্ ঘরে ছিল।

(ক) ইতি-কাকিমা শোবার ঘরে ছিলেন না।

(খ) নবীন শোবার ঘরে ছিল না, বসার ঘরেও নয়।

(গ) রান্নাঘরে যে-ছিল সে বসুপরিবারের কেউ নয়। অর্থাৎ তার স্বামী বসু নয়।

এটাই এবারের প্রথম ধাঁধা। এবং খুব সহজ ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ মেয়েদের দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায়, প্রতিটি মেয়ের যত বোন ততজনই ভাই, আর ছেলেদের দিক থেকে বলতে

গিয়েছে। সেই শব্দ শুনেই প্রত্যেকেই ঘর থেকে বাইরে চলে আসে। সেই সময় একটা লোক খুব দ্রুত দৌড়ে চলে যায় বাইরে, আবছামতন তাকে সবাই দেখেছে, কিন্তু ঠাহর করতে পারেনি। সেজকাকা আর নবীন পিছন-পিছন দৌড়েছিল, কিন্তু ওই অন্ধকারে কোন্ দিকে পালিয়ে গেছে চোরটা—খুঁজে পায়নি।

নবীনের কাছ থেকে সব শুনল ছোটকা। তারপর, নবীন চলে গেলে, আমাকে বলল, এই চুরি নিয়েই একটা ধাঁধা ভেবেছি সতুবাবু। লিখে নাও। আমি লিখে ফেললাম।

তিনটে সূত্র দেওয়া হল। এ-

গেলে, প্রত্যেক ছেলের যত বোন তার অর্ধেক সংখ্যক ভাই। এরকম পরিবারে কটি ছেলে কটি মেয়ে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাটি কত?

২৩৪ (৩৩৩) ৫৬৭

৩৪৫ (?) ৬৭৮

চতুর্থ ধাঁধা ॥ পরবর্তী সংখ্যাটি কত?

১, ৩, ৭, ১৩,?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১/৫, ১/৭ (২) ব্যাটের দাম ১.২৫, বলের দাম ০.২৫ পয়সা (৩) বাড়িমুখো হাঁটবে। (৪) গড্ডলিকাপ্রবাহ।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ডট পেনের মাথার ছবি। ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ শিকার করতে গেছি, একজন গ্রামবাসী এসে খবর দিল আধ মাইল উত্তরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছে। আমার তখন দরকারি কোন্ কথাটা জানা প্রয়োজন?

উঃ অবিলম্বে জানা দরকার দক্ষিণটা কোন্ দিকে।

প্রঃ কোথাকার ভগবান বেশ ভদ্রলোক?

উঃ ভদ্রেশ্বরের।

প্র: মস্কোতে তো এবার অলিম্পিক হচ্ছে, কী করে যাওয়া যায় বলুন তো?

উ: ১০ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়তে পারলেই অলিম্পিকে পৌঁছে যাবে।

প্র: চীনের মাটিতে কোন জিনিস সবচাইতে ভাল জন্মায়?

উ: কাপ-প্লেট।

প্র: কোথায় সবাই পা দিয়ে তাল ঠোকে?

উ: পাতালে।

প্র: কোথায় ভাল চন্দনকাঠ পাওয়া যায়?

উ: চন্দননগরে।

সুসেন

মজার খেলা

অনেকে মিলে খেলা যায় এই মজার খেলাটা। আর মজাও জমে ওঠে ক্রমশ ক্রমশ।

গোল হয়ে বসো কয়েকজন মিলে। তুমি নিজেও থাকবে এই বৃত্তের মধ্যে। তুমিই বুঝিয়ে দেবে খেলাটার নিয়ম এবং নিজেই শুরু করবে।

তুমি যে-কোনো অক্ষর দিয়ে একটা শব্দ বলবে। ধরো অ অক্ষর দিয়ে খেলাটা শুরু করবে তুমি। অ-দিয়ে তুমি হয়তো বললে, অজ। তোমার ডান দিকে যে থাকবে সে অ-দিয়ে আরেকটা শব্দ বলবে, তার আগে তোমারটাও বলবে। অর্থাৎ সে যদি শব্দ ভেবে থাকে অল্প, তাহলে বলবে, অজ, অল্প। তার ডান দিকের লোকটি এরপর 'অজ, অল্প,'—এ দুটো শব্দ বলবে, তাছাড়াও নিজে অ-দিয়ে একটা নতুন শব্দ উচ্চারণ করবে। সে হয়তো বলল—ধরা যাক—অজ, অল্প, অন্ধ।

এইভাবে পুরো বৃত্তে যে-কজন লোক সবাই খেলাটা খেলতে থাকবে। শব্দ ক্রমশ বাড়বে। ফের যখন তোমার কাছে ফিরে আসবে, তখন তুমি নতুন একটা অক্ষর দিয়ে নতুন একটা শব্দ বানাবে। কিন্তু আগের বলা সব কটা শব্দ বলে তবেই এই নতুন শব্দ বলতে হবে তোমাকে। তোমার পরের লোকও একইভাবে অ-দিয়ে বলা সব কটি শব্দ এবং নতুন-বাছা অক্ষর দিয়ে বলা শব্দ বলে তবে নতুন শব্দ বলবে।

এইভাবে খেলাটা চলতে থাকবে। যে প্রথমে কোনো শব্দ বলতে ভুলে যাবে, সে আউট। শেষ পর্যন্ত যে টিকে থাকবে সেই জয়ী।

দারুণ মজার খেলা। চেষ্টা করেই দ্যাখো।

মজারু

হাসিখুশি

এক ভদ্রমহিলা একটি কুকুর-ছানা পুষেছেন, খুব প্রিয় তাঁর কুকুর-ছানাটি। একদিন একটি বোলতা সেই কুকুরছানাটির নাক কামড়ে দিল। কুকুরছানার সারা মুখটা রবারের বলের মতো গোল হয়ে ফুলে উঠল। ভদ্রমহিলা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পশু-ডাক্তারকে ফোন করলেন। ডাক্তার সব শুনে বললেন, "চিন্তা নেই, কিছু হবে না, গরম জল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিন।" ভদ্রমহিলার উদ্বেগ দূর হল না, "ডাক্তারবাবু, অ্যাসপিরিনে কোনো কাজ হবে?" ডাক্তারবাবু অগত্যা বললেন, "তা হবে।" ভদ্রমহিলার আবার প্রশ্ন : "ডাক্তারবাবু, একটা না দুটো অ্যাসপিরিন?" ডাক্তারবাবু বললেন, "দুটো আপনি খান, আর একটা কুকুরকে দিন।" বলে ফোন নামিয়ে রাখলেন।

বাচ্চা ছেলে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তার মা তো অবাক। এ কী কাণ্ড!

"কী হয়েছে?" জিজ্ঞাসা করায় ছেলেটি বলল, "আমি স্বপ্ন দেখলাম তুমি অন্য একটা ছেলেকে এক বাক্স চকোলেট দিয়েছ।" তারপর আরো ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল "আমি যদি আর কখনো এ-রকম স্বপ্ন দেখি তোমার সঙ্গে আর জীবনে কথা বলব না।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

nbt
এ বছর
আন্তর্জাতিক
শিশু বর্ষ
কোনো ছোট্ট বন্ধুর জন্য এ মাসে
কোনো বই কিনেছেন কি ?
মন ভুলানো গল্প, চেয়ে থাকার মতো ছবি আর
অবাক হবার মতো নতুন নতুন বিষয়—এই নিয়ে
আমাদের ছোটদের বই
মূল্য ঃ দেড় টাকা এবং আড়াই টাকা
এন বি টি বুক সেন্টার ৬৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
অন্যান্য যাদের কাছে আছে
স্টার বুক হাউস ৬৫-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● উষা পাবলিশিং হাউস ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭২
● ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● সিনহা বুক এজেন্সী ৭৯/২, মহাত্মা গান্ধী
রোড, কলিকাতা-৯ ● সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী ২২, রাজা উডমাণ্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১ ● চৌধুরী সেলস কনসার্ন
তিনকোনিয়া, বর্দ্ধমান ● সেলস এম্পোরিয়াম, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন ৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১
ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ২৯ ॥

ভারতের ফুটবল খেলায় যেমন বাংলার আধিপত্য ক্রিকেটে তেমনি বোম্বাইয়ের, বরং তার চেয়েও বেশি। আমাদের জাতীয় ক্রিকেট অর্থাৎ রঞ্জি ট্রফির খেলা শুরু হয়েছে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মরসুম থেকে। আটাত্তর-ঊনআশি পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশবার প্রতিযোগিতার মধ্যে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সাতাশবার। এর মধ্যে আটান্ন-ঊনষাট থেকে বাহাত্তর-তিয়াত্তর পর্যন্ত একটানা পনেরোবার চ্যাম্পিয়ন হবার এক দারুণ রেকর্ড আছে। আর বাংলা তো রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে মাত্র একবার। সেই আটত্রিশ-ঊনচল্লিশ মরসুমে। তাও বেশ কিছু ভাল ইউরোপীয়ান ক্রিকেটার তখন বাংলা দলে ছিলেন বলে।

আমরা যখন বোম্বাইয়ের সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলেছি তখন গর্ব করার মতো ওদের অবস্থা ছিল বইকী। বছর বছর তখন ব্যাটে-বলে বোম্বাই বিজয়-বাজনা বাজিয়ে চলেছে। কী দারুণ টীম। পলি উমরিগড়, জি এস রামচাঁদ, রামকান্ত দেশাই, ফারুক এঞ্জিনীয়ার, দিওয়াদকর, বুধি কুন্দেরন, বাপু নাদকার্নি, অজিত ওয়াদেকর, বালু গুপ্তে, রমেশ ডিভেচা—সবাই ক্রিকেটের দিকপাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার চার্লি স্টেয়ার্সও সেমিফাইনালে আমাদের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন বোম্বাইয়ের হয়ে। তবে বাবার অসুখের জন্য উমরিগড় সেমিফাইনাল খেলতে বাংলায় আসতে পারেননি। অধিনায়ক ছিলেন রামচাঁদ।

বোম্বাইয়ের সঙ্গে আমাদের সেমিফাইনাল খেলা শুরু হয়েছিল তেষট্টি সালের মার্চ মাসের তিন তারিখে। তারিখটির কথা বিশেষ-ভাবে মনে আছে দুটি কারণে। এক, টেস্ট খেলা ছাড়া কোনো ক্রিকেট ম্যাচে ইডেনে অত দর্শক-সমাগম আর হয়েছে কি না সন্দেহ। টিকিট না পেয়ে হাজার পাঁচেক দর্শককে মাঠ থেকে ফিরে যেতে হয়েছিল। দুই, ওই তিন তারিখেই খেলার পর সরাসরি মাঠ থেকে আমরা দল বেঁধে হাওড়া গিয়েছিলুম মান্নাদার বিয়ের প্রীতিভোজে যোগ দিতে।

মান্নাদার মামা ইন্দুভূষণ সামন্ত, যাঁর বাড়িতে প্রীতিভোজ হচ্ছিল এবং মান্নাদার মামা বলে মোহনবাগানের সবাই যাঁকে মামা বলে ডাকত, আমার পাতের কাছে এসে বললেন, "এ কী চুনী, শুনলুম বোম্বাইয়ের বাঘা-বাঘা বোলারের বল খেলেও তুমি নট আউট আছ, এখানে দুখানা ফ্রাই আর একটা মিষ্টি খেয়েই আউট।" বলাইদা চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, না, চুনীর বেশি খেয়ে কাজ নেই। শেষকালে সেই বোম্বাইয়ে ভেলপুরি খাওয়ার মতো অবস্থা হবে।"

বোম্বাইয়ের কাছে আমরা হেরে গিয়ে-ছিলুম এক ইনিংস ৩১ রানে। সূচনা কিন্তু খারাপ ছিল না। প্রথম দিন আমরা করেছিলুম পাঁচ উইকেটে ২৩৪ রান। সওয়া চার ঘণ্টা উইকেটে থেকে পঙ্কজদা করেছিলেন ৮১ রান। তার মধ্যে ড্রাইভ, কাট ও হুক মিলিয়ে চৌদ্দটি ছিল চোখ-ধাঁধানো স্ট্রোক। আমি ছয় নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ২৪ রানে নট আউট ছিলুম। পরের দিন আউট হয়ে গেলুম ৩৮ রান করে বাংলার ইনিংস শেষ হল ৩২২ রানে।

আমাদের মোটামুটি ভাল ইনিংসের বিরুদ্ধে দারুণ ভাল ব্যাট করেছিল বোম্বাই। দুই ওপেনার ফারুক এঞ্জিনীয়ার এবং সুধাকর অধিকারীর সেদিন সংহারমূর্তি। দুজনে আমার বলে যে কী মার মেরেছিলেন আজও মনে আছে। আমার এক ওভার থেকেই করে-ছিলেন ২৫ রান। তার মধ্যে চারটি চার, একটি ছক্কা। কিন্তু এঞ্জিনীয়ার আমার প্রথম তিন বলে ১৪ রান করার পর চতুর্থ বলেই আমি পেয়ে যেতাম তাঁকে, যদি তাঁর লোপ্পা ক্যাচটি পরিবর্ত ফিল্ডসম্যান অম্বর দত্ত ফেলে না দিত। এঞ্জিনীয়ার শেষ পর্যন্ত করেছিলেন ১৬২ রান। সুধাকর অধিকারী ১৩৩। অধিনায়ক রামচাঁদও একটি সেঞ্চুরি (১০৭ রান) করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে বোম্বাই করেছিল পাহাড়-প্রমাণ ৫৫২ রান। উল্লেখ্য রঞ্জি ট্রফির খেলায় ফারুকের ওটিই ছিল প্রথম সেঞ্চুরি।

আমার সান্ত্বনা ছিল, ফারুক আমার বল

৫ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের দাঁতে সহজেই ক্যাভিটি হতে দেখা যায়। এসব বছরেই দাঁত ক্যাভিটির কবলে পড়ে। তাই দাঁত পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য আপনার বাচ্চাকে নিয়মিতভাবে দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। ত'বে রোজ আপনি নিজের বাড়ীতে বসে সহজেই দাঁতের ক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকবার খাওয়ার পর কলগেট দিয়ে দাঁত ব্রাশ ক'রে।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে জীবাণু সৃষ্টি হয়। ফলে, মুখে দুর্গন্ধ এবং পরে যন্ত্রণাদায়ক দাঁতের ক্ষয় শুরু হতে পারে। কলগেটের অপূর্ব্ব সক্রিয় ফেনা দাঁতের ভেতরে গভীরে পৌঁছে বিপজ্জনক খাবারের টুকরো আর জীবাণু দূর ক'রে দেয়। তাই আপনার বাচ্চাকে, প্রতিবার খাওয়ার পর কলগেট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে শেখান। বাচ্চারা কলগেট দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালওবাসে। কারণ, এতে আছে সতেজ পিপারমিণ্টের স্বাদ।

জীবাণুমুক্ত নির্ম্মল শ্বাস প্রশ্বাস ও ঝকঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশী কেনে কলগেট টুথপেস্ট।

DCG.70 BN

যেমন মেরেছিলেন, তেমন আমাদের দলের ফাস্ট বোলার লেস্টার কিংয়ের বলকেও ছেড়ে কথা কননি। আর ওই ম্যাচে, রঞ্জি ট্রফিতে আমার দ্বিতীয় খেলায় দেশাই-স্টেয়ার্স-নাদকার্নি - রামচাঁদ - দিওয়াদকর কোম্পানির বলের বিরুদ্ধে আমার ৩৮ এবং ৬৮ রানকে কি খুব খারাপ স্কোর বলা যায়? দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার ১৯৯ রানের ইনিংসে আমার ৬৮ ছিল সর্বোচ্চ। তার পরই পঙ্কজ রায় ও অম্বর রায়ের—৩৭ করে। আমাদের পাঁচটি উইকেট পড়ে গিয়েছিল মাত্র ৬৯ রানে। ষষ্ঠ উইকেট জুড়িতে আমি ও অম্বর রায় করেছিলুম ৮০ রান। দুটি ম্যাচ খেলেই আমি ক্রিকেটারের স্বীকৃতি পেয়ে গেলুম।

চীনা হামলার সময়ে ডিফেন্স ফান্ডে অর্থ সংগ্রহের জন্য বর্তমান ও অতীতের নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়ে ওই বছর ভারতের নানা জায়গায় বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হয়। লালা অমরনাথ বনাম এস মুস্তাক আলীর একাদশের প্রদর্শনী খেলাটিতে আমাকেও দলে নেওয়া হয়েছিল।

নিয়মানুবর্তিতার কথা মনে রেখেই স্টাফ ট্রেনিং কলেজে আবার যোগ দেবার জন্য ইডেনে সেমিফাইনাল ম্যাচ শেষ হবার পরদিনই হায়দরাবাদ পেঁাছে গিয়েছিলুম। এরোড্রোমে দাঁড়িয়ে হস্টেলে যাবার জন্য ট্যাক্সির খোঁজ করছি এমন সময় পিঠে কার যেন মৃদু করাঘাত। পেছনে তাকিয়ে দেখি স্যুট ও ফেল্টহ্যাট পরা সেই মূর্তিমান বোলার রয় গিলক্রিস্ট। প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। বিদেশ-বিভুঁয়ে একলা পেয়ে মারবে নাকি! ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু পরে ভাল করে চেয়ে দেখলুম আচরণে সেই উগ্র ভাবটা নেই। বললেন, ''ট্যাক্সি আমার সঙ্গেই আছে। চলো তোমাকে হস্টেলে ছেড়ে দিয়ে যাব।'' দ্বিধা সত্ত্বেও ট্যাক্সিতে উঠে বসলুম, কিন্তু কোনো আলোচনায় আগ্রহ দেখালুম না। ভাবলুম কী বলতে কী বলব আবার রেগে যাবে। গিলক্রিস্ট সিগারেটের কৌটোটা খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আর এক বিপদ। আমি কখনো ধূমপান করিনি। কিন্তু গিলক্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করি কীভাবে? যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বললুম, "মিঃ গিলক্রিস্ট, আমি দুঃখিত তোমার দান প্রত্যাখ্যান করছি বলে। আমি

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ফোটো তপন দাস

নন-স্মোকার।" গিলক্রিস্ট হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, ''ওঃ ইউ আর এ ফুটবলার। ভেরি গুড। বাট কল মী 'গিলি'—নট মিঃ গিলক্রিস্ট। উই আর ফ্রেন্ডস।"

ঠিক একইভাবে পঙ্কজদার সঙ্গেও বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন গিলক্রিস্ট। বাংলা ও হায়দরাবাদের ঘটনাবহুল কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের পর নিউ মার্কেটে কেনাকাটা করার সময় হঠাৎ পঙ্কজদার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন পঙ্কজদাই নিজের গাড়িতে গিলক্রিস্টকে তাঁর হোটেলে পেঁাছে দিয়েছিলেন। গলায় আক্ষেপের সুর এনে গিলক্রিস্ট বলেছিলেন ''রায়, মাঠের কথা কিন্তু মনে রেখো না, ভুলে যেয়ো।''

পরে পঙ্কজদার ব্যাটিং টেকনিকের অসম্ভব প্রশংসা করেছেন ওই অসাধারণ ফাস্ট বোলার। মানুষ হিসেবে খুব মন্দ ছিলেন না কিন্তু রেগে গেলে দানব হয়ে উঠতেন।

রঞ্জি ট্রফিতে আমার প্রথম দুটি খেলার কথা লিখতে লিখতে ফুটবলের কথা এড়িয়ে গেছি। চীনা হামলার জন্য বাষট্টিতে ডুরান্ড কাপের খেলা বন্ধ থাকায় মোহনবাগান টানা চারবার ফাইনাল খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু তখন কি জানতুম তেষট্টি থেকে আবার পর পর তিনবার আমরা ডুরান্ড ফাইনাল খেলব।

ডুরান্ডের কথা পরে লিখব। তার আগে কলকাতার সিজনের কথা বলে নিই। আমাদের সময়ের আগে থেকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হবার পর কলকাতার ফুটবলের রমরমা প্রধানত মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলাকে কেন্দ্র করে। তার প্রমা

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের হাত থেকে সিমলা ট্রফি নিচ্ছেন চুনী গোস্বামী (১৯৬৩)

সাতচল্লিশ থেকে উনআশি সাল পর্যন্ত একবার ইস্টার্ন রেল (১৯৫৮) ও একবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব (১৯৬৭) ছাড়া কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হয় ইস্টবেঙ্গল না-হয় মোহনবাগান। কিন্তু এই দুই দলের পারস্পরিক খেলার ফল সব সময় দলগত শক্তি বা দুর্বলতার উপর নির্ভর করেনি। স্নায়ুচাপ, মনের জেদ, ক্রীড়া-বিন্যাস এবং দলগত সংহতিতেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে। উনপঞ্চাশে ইস্টবেঙ্গল ছিল দুর্ধর্ষ টীম। বেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ ও সালেকে নিয়ে বর্শাফলার মতো তীক্ষ্ম ফরোয়ার্ড লাইন। কিন্তু তোমরা কি জানো ওই বছর লীগের দুটি খেলাতেই ইস্টবেঙ্গল হেরে গিয়েছিল মোহনবাগানের কাছে? যে তেষট্টি-মরসুমের কথা লিখছি ওই মরসুমের সঙ্গে অনেকটা সঙ্গতি আছে এই উনআশি মরসুমের। সেবার আমরাই লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম একটি খেলায় ইস্টবেঙ্গলকে ৩—০ গোলে হারিয়ে এবং একটি খেলায় ইস্টবেঙ্গলের কাছে ০—২ গোলে হেরে গিয়ে।

প্রথম খেলাটিতে আমার গোলেই মোহনবাগান ১—০ এগিয়ে যায়। তার পর ইস্টবেঙ্গলকে প্রায় কোণঠাসা করে আরও দুটি গোল পাই আমরা। ফিরতি খেলার আগে আমাদের ধারণা ছিল এবারও ইস্টবেঙ্গলকে উড়িয়ে দেব। কিন্তু ফল হল উল্টো। ইস্টবেঙ্গল শুরু থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে খেলেছিল, যার ফলে এক সাধারণ খেলোয়াড়কে দিয়ে করিয়েছিল প্রথম গোল। খেলোয়াড়টির নাম নুর। শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়। শ্রীলঙ্কা থেকে আগের দিন এসে এবং খেলার দিন আই এফ এ অফিসে রেজিস্ট্রি হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে প্রথম খেলেছিল। পরে কোনো ম্যাচেই ভাল খেলতে পারেনি। আমাদের বিরুদ্ধেও যে ভাল খেলেছিল, তা নয়। তবে কাজের কাজটি করেছিল এবং এক মন এক প্রাণ হয়ে খেলেছিল ইস্টবেঙ্গলের গোটা দল, যেমন এবারের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান খেলেছে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। অথচ দ্যাখো, লীগে এবার ইস্টবেঙ্গল কী দাপটে খেলেছিল মোহনবাগানের সঙ্গে। সে খেলায় অবশ্যই ইস্টবেঙ্গলের তিন-চার গোলে জেতা উচিত ছিল। খেলাটি ১—১ গোলে ড্র হল। আবার কে অস্বীকার করতে পারে যে, শীল্ড ফাইনালেও মোহনবাগান জিততে পারত তিন-চার গোলে, জিতল কিন্তু মাত্র ১—০ গোলে। একই বছরে এবং প্রায় একই খেলোয়াড়

নিয়ে গড়া দুই দলের খেলার কী বিরাট পার্থক্য।

তেষট্টির ডুরান্ড ফাইনালে আমরা যখন হায়দরাবাদ পুলিসের মুখোমুখি হলুম তখন ভেবেছিলুম দিল্লির শুকনো মাঠে ওরা আই এফ এ শীল্ড ফাইনালের বদলা নেবে। কলকাতার নরম মাঠে এবং আমাদের অগণিত সমর্থকদের সামনে হায়দরাবাদ দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এক কথা আর দিল্লির শুকনো মাঠে খেলা আর-এক কথা। প্রাণপণে লড়েছিলও হায়দরাবাদ দল। কিন্তু আমার খুশির কারণ ওই ম্যাচে আমি যা করতে চেয়েছিলুম তাই করতে পেরেছিলুম। আমার দেওয়া দুটি গোলে জিতে মোহনবাগান পেয়েছিল ডুরান্ড কাপ।

আবার এ বছরের লীগ খেলার কথায় ফিরে আসছি। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলার কথায়। পজিশন মতো দাঁড়িয়ে থেকে চিন্ময় চ্যাটার্জির ভুল ব্যাক পাসের সুযোগ নিয়ে মানস ভট্টাচার্য যেভাবে গোল করেছিল ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে, অনেকটা ওইভাবেই ডুরান্ড ফাইনালে আমি প্রথম গোলটি করেছিলুম হায়দরাবাদ পুলিসের বিরুদ্ধে। ওদের গোলকীপার সেলিম, সে ভারত দলেও খেলেছে, বেশ ভাল খেলোয়াড় ছিল। কিন্তু একটা বদ অভ্যাস ছিল। মাঝে মাঝে বিনা প্রয়োজনে গোল ছেড়ে এগিয়ে আসত এবং পেনাল্টি বক্সের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকত। আমাদের একটি সাধারণ ধরনের আক্রমণের মুখে সেলিম গোল ছেড়ে এগিয়ে এসে বল কিক করে দিল সালের (জুনিয়র) কাছে। কোনো বিপদের আশঙ্কা ছিল না। আমি সালের পাশে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। বলটি আসছে দেখে দেহের দোলায় সালেকে মাটাল করে বলটি ধরেই চকিতে গোলে লব করলুম। সেলিম তখনো পেনাল্টি বক্সের মাথায় নির্ভাবনায় দাঁড়িয়ে ছিল। পেছন দিকে ফিরে যেতে যেতে দেখল আমার লব করা বল গোলের জালে জড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় গোলটি করেছিলুম একক প্রচেষ্টায়, প্রায় মাঝ-মাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে নিখুঁত নিশানায় শট করে। সেদিন মাঠের বাইশজন খেলোয়াড়ের মধ্যে আমি সত্যিই ছিলুম সবচেয়ে সুখী মানুষ। (ক্রমশ)

মণিমেলার খবর

মণিমেলা মহাকেন্দ্রের শাখাকেন্দ্রগুলি ১ জুলাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিবস পালন করে। বিধানচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, তাঁর জীবনী আলোচনা এবং বিভিন্ন হাসপাতালে শিশু রোগীদের ফল, ফুল ও মিষ্টি বিতরণ অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বসিরহাট আঞ্চলিক কর্মী প্রশিক্ষণ শিবিরে সম্প্রতি ১০০ জন কর্মী ও মণিভাইবোন অংশ নেয়।

দুর্গাপুর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন মণিমেলার দেড়শো জন ভাইবোন ও কর্মী শারীরিক কলাকৌশল, ড্রিল, ব্রতচারী ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে।

আরামবাগ অঞ্চলের মণিমেলাগুলির উদ্যোগে কিছু দিন আগে শিশু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়ায় বাণীতীর্থ মণিমেলার ভাইবোনেরা পশ্চিমবঙ্গ লাঠি সমিতির ষোড়শ রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

মণিসন্দেশ

মণিমেলার এই শাখাকেন্দ্রগুলি সম্প্রতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব, ক্রীড়া-সঙ্গীত-নৃত্য প্রতিযোগিতা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদির আয়োজন করেছিল : দুর্গাপুরের পাপড়ি মণিমেলা, আসানসোলের সোনার তরী মণিমেলা, সোনারপুরের কিংশুক মণিমেলা, গাইঘাটার সূর্য সেন স্মৃতি মণিমেলা, মধ্যমগ্রামের পল্লীশ্রী বিধান মণিমেলা, পল্লীভারতী মণিমেলা, সুভাষ মণিমেলা, হাবড়া অশোকনগরের নবারুণ মণিমেলা, জাগ্রত মণিমেলা।

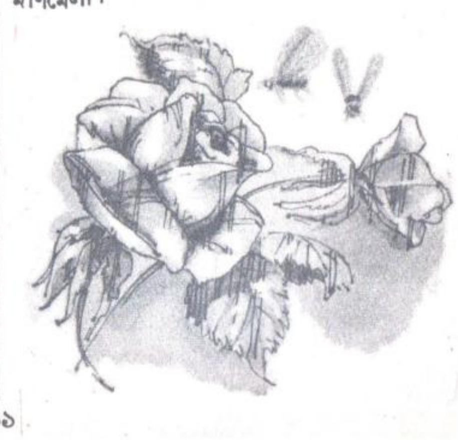

দুষ্টুমী করার
এইতো বয়স
অ্যাডভিটামিন মালিশ করুন,
হাজার দুরন্তপনা সত্ত্বেও
স্বাস্থ্য অটুট থাকবে
বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েরা দুষ্টুমী করবে—
এটাই তো স্বাভাবিক। রোদে খেলবে, বৃষ্টিতে
ভিজবে, খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে—
এটাই তো নিয়ম। এতে ভাবনার কিছু নেই।
সারা বছর নিয়ম করে অ্যাডভিটামিন
মালিশ করুন। এই তেলের 'এ' ও 'ডি'
উপাদান শরীরকে দুরন্তপনার সব
চোট থেকে বাঁচাবে। ত্বক খসখসে হতে
দেবে না, হাড় মজবুত করবে।
ADVITAMIN
FOR GROWTH AND VIGOUR OF THE BABIES
AD
VITAMIN
MASSAGE OIL FORTE
SUNNY
সানি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড

ওই যে আমার ভাইটু এখন

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওই যে আমার ভাইটু এখন খেলতে গেল, ওই যে
বোনটা আমার চুপটি খাটে একটুও নেই হৈচৈ,
ওই যে আমার দিদির গালে চ্যুয়িঙগামের ছাবনা,
ওই যে আমার দাদার মাথায় রঙবেরঙের ভাবনা—
রাত পোয়ালেই কুটকুটিয়ে চিবোয় যে সব বিস্কুট,
আট-সকালেই হুমড়ে ছোটে হাই-ঝাঁপিয়ে বিশ ফুট।
ইশকুলে যা—যেই ডাকে মা, আর কথা নেই লাগসই,
ওই যে দিদি হাঁপসে পড়ে ভরছে আচার বাকশোয়,
অংকখাতার মধ্যে দাদা নিচ্ছে ভরে 'কিঙকঙ'—
ইশকুলে যা—ইশকুলের আর নেই তো যাবার দিনক্ষণ!
মাঞ্জা সুতোর পুঁটলি এখন যায় রেখে কার দেখতা!
এই যে এত গুলতি-গুলি, ফিরলে পাবে একটাও?
আসল কথা দাদার খালি আমার পরে হিংসে,
নিজের ঘুঁটি আঁটিশুঁটি পরের বেলায় চিমসে।
সত্যি কথা বলতে কি ওই দিদিও খুব কম না,
এক ফোঁটা হোক এদিকসেদিক আছড়াবে ঘরকন্না।
কী কান্ডটা করল সেদিন মানতে কি না দেখলে?
কী, না ওনার হারিয়ে গেছে একটা মোটে চিকলেট!
আরো যে ওই তিনটে আছে একবারও কেউ বলছে?
দেখল কি সেই তখন থেকে দাদারও মুখ চলছে?
নজর খালি কোথায় আমার প্যান্টটা বুঝি উঁচকো,
ব্যস, তুলে নাও পালক-ছেঁড়া কর্কটা, ভুরু কুঁচকে!
বলব কী, যার জন্যে এত ঘর-ফাটানো হৈচৈ—
সেই সে আমার ভাইটু এখন খেলতে গেল, ওই যে…

ছবি দেবাশিস দেব

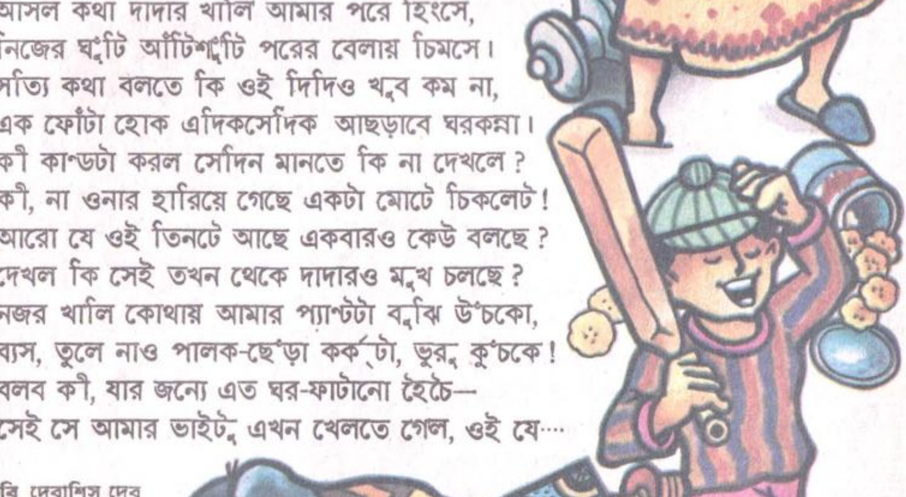

ছোটদের যত সেরা বই

সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে একাই এক প্রতিষ্ঠান। এক এবং অনন্য। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাবতীয় রচনা ও ছবির বিপুলায়তন সংগ্রহ 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র'। যে-কোনও বয়সী পাঠকই অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করবেন অমূল্য এই সংগ্রহ নিজস্ব ভান্ডারে রাখতে। দু-খণ্ড বেরিয়েছে, তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। সম্পাদনা করেছেন সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু। সুকুমার রায়ের সমগ্র শিশু-সাহিত্য আবার আলাদাভাবে অতি সুলভ মূল্যে একটি মাত্র খণ্ডেও পাওয়া যায়। আরেকটি অভিনব সংকলন—'জীব-জন্তু।' আমাদের চারপাশের জানা অজানা জন্তুজানোয়ারদের নিয়ে নানান তথ্যে ভরা বই।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় হাসির সঙ্গে মজা, মজার সঙ্গে রোমাঞ্চ, রোমাঞ্চের সঙ্গে উৎকণ্ঠার এক আশ্চর্য মিশেল ঘটিয়েছেন তাঁর 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি' উপন্যাসে। রাজা গোবিন্দনারায়ণ কেন বিচিত্র ভাষায় কথা বলেন, মনোজদের বাড়িটা ঠিক কোনখানে, সে-বাড়িতে যে-অচেনা ছেলের ছবি রয়েছে সেই ছবিটি কার কিংবা কীভাবে এক নিখোঁজ যুবরাজ হয়ে গেলেন ডাকাত-দলের মেজ-সর্দার, এ-সব প্রশ্নেরই উত্তর এই উপন্যাস। তাঁর নতুন-বেরুনো 'গোঁসাইবাগানের ভূত' একেবারে অন্য ধরনের। ভূত নিয়ে লেখা এক দুর্দান্ত অদ্ভুতুড়ে উপন্যাস 'গোঁসাইবাগানের ভূত।'

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৬ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬ সোনার কেল্লা ৬ বাক্স-রহস্য ৬ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এণ্ড কোং ৮ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ঙ্কর সুন্দর ৫ সত্যি রাজপুত্র ৫ তিন নম্বর চোখ ৫ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ ডুংগা ৮ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬ সমগ্র কিশোর সাহিত্য (১ম) ২০ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫ যাঁর নাম ঘনাদা ৫ ঘনাদার ফুঁ ৬ তেল দেবেন ঘনাদা ৮ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণ-মালা ৩ মিতুল নামে পুতুলটি ৪ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬ বাজনা ৬ হুপোকে নিয়ে গপ্পো ৫ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ পাথরের চোখ ৬ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৬ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাসবাড়ি ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ গোসাইবাগানের ভূত ৮ **ইন্দ্রমিত্রের** শরৎ কথামালা ১০ বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫ **মতি নন্দী** ক্রিকেটের আইন কানুন ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেঞ্চার : প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৬ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৪ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

জন্মদিনের বদলে

প্রসাদ

চামেলির জন্মদিনে তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ হয়। বেলুনে, রঙিন কাগজে ফোলানো হাতি আর খরগোশে সে-দিন বাড়িতে এমন অবস্থা হয় যে, ভদ্রলোক সেখানে টিকতে পারে না। ভদ্রলোক মানে শ্রীমান চম্বলবাবু। সে তো এখন বড় হয়ে গিয়েছে, তাই এসব ছেলেমানুষি আর তার ভাল লাগে না।

মাকে বলে চম্বল ঠিক করেছে তার জন্মদিনে এসব পার্টি-টার্টি হবে না। তার বদলে সে তার বন্ধুদের বছরে একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবে, যেদিন তার খুশি। সে নিজেই উপলক্ষ ঠিক করবে। যেমন ধরো, এ বছর পার্টি হবে তার প্রিয় দলের ফুটবল লীগে জেতা উপলক্ষে। গেল বছর হয়েছিল ইস্কুল ম্যাগাজিনে তার লেখা গল্প ছাপা হয়েছিল, সেই উপলক্ষে।

Chameli gives a party to her friends on her birth-day.

Chambal doesn't give a party to his friends on his birth-day.

He gives a party to his friends once a year.

He chooses the occasion for his party.

*

Last year the school magazine published a story by him.

That was the occasion for his party last year.

He read the story to his friends at the party.

They had to listen to the story.

His friends suggested that they should read the story at home.

They all had their copies of the magazine.

Chambal didn't agree to this.

এ-বার এ-বছরকার কথা শোনো। এ-বছর কী হবে ঃ

This evening Chambal and his friends are going to have a party in the garden.

This morning Chambal and his father went to the market.

They brought mutton and fresh vegetables.

Father also ordered a cake.

Chambal wanted a bigger cake.

Father paid no attention to him.

He told the confectioners he wanted a medium-sized cake.

The cake is going to arrive in the afternoon.

His freinds are going to be here by five o'clock.

Chambal hopes it's not going to rain.

*

Chambal is looking at the sky anxiously.

The sky is turning rather dark.

A wind is blowing from the east.

Is it going to blow the clouds away ?

এতক্ষণ যা পড়লে তার মধ্যে কিছু আগেকার কথা আছে, কিছু এখনকার কথা আছে, আর কিছু আছে যা হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ যা ভবিষ্যৎ, তার কথা। তোমরা এর মধ্যে থেকে খুঁজে খুঁজে ভবিষ্যতের কথা যাতে আছে সেই বাক্যগুলো আলাদা করো, তারপর ওই ধরনের বাক্য আরো কয়েকটি লেখো চম্বলের পার্টিতে কী কী হবে তাই নিয়ে।

আতঙ্ক

সেদিনকে রাম ঝিমোচ্ছিল ক্লাসে
এমন সময় মাথায় খটাস করে
পড়ল কী যে ভেবেই মরে ত্রাসে
নিশ্চয়ই স্কাইল্যাবটা।
ওরেব্বাবা সামনে ভূগোল-স্যার
এক্ষুনি সব প্রশ্ন হবে হাজির
না পারলে গুঁড়িয়ে দেবেন হাড়
মনে আছে একটু আগের গাঁট্টা।

প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১৪)

আড়ি-ভাব

আড়ি-আড়ি-আড়ি
তোমার সাথে আড়ি
কিনে দেব গাড়ি
আড়ি-আড়ি-আড়ি।
ভাব-ভাব-ভাব
তোমার সাথে ভাব
খেতে দেব ডাব
ভাব-ভাব-ভাব।

মিমি আদিত্য (বয়স ৮)

ছবি এঁকেছে **চন্দন বৈতালিক** (বয়স ১৫)

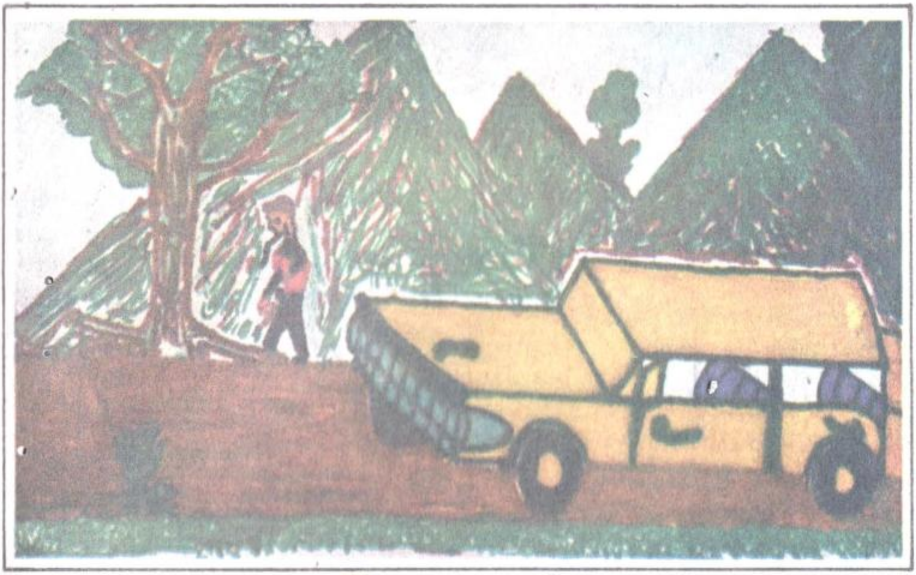

ছবি এঁকেছে অরিন্দম ভাদুড়ী (বয়স ৯)

দুপুরবেলায়

মা সকালবেলা স্কুলে যায়। বাবা দুপুর-বেলা অফিসে যায়। বাবা অফিসে যাওয়ার সময় আমাদের জন্যে থালায় ভাত রেখে যায়। আমার বোনের নাম রুম্পা। আমি বোনকে নিয়ে স্কুলে যাই। আমাদের বাড়ির পাশে পিণ্টুদাদার বাড়ি।

বাবা অফিসে যাওয়ার সময় ঘরে তালা দিয়ে চাবি পিণ্টুদাদার বাড়িতে রেখে যায়। আমি বোনকে নিয়ে স্কুল থেকে এসে চাবি দিয়ে ঘর খুলি। তারপর আমরা দুজন ভাত খাই। বোনকে নিয়ে খেলা করি। ছড়া বলি। আবার কখনো পিণ্টুদাদাদের বাড়িতে যাই। সেদিন দুপুরে বাড়িতে পাখা ছিল না। বোনকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমি পাখা দিয়ে হাওয়া করছিলাম। ছড়া বলছিলাম। ছড়া শুনতে-শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি একা-একা বিছানায় বসে ছিলাম। একা থাকলে আমার কান্না পায়। ঠাকুমা-দিদিমা-মাসি-পিসি কেউ বাড়িতে নেই। এই সব ভাবতে ভাবতে আমিও ঘুমিয়ে পড়ি। একটু পরে ঘুম থেকে উঠে দেখি রুম্পা কাঁদছে আর আমাকে পাখা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে। আমি অমনি তাড়াতাড়ি উঠে বসে রুম্পাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে নিলাম।

সুলগ্ন বিশ্বাস (বয়স ৭)

বৃষ্টির গল্প

আমি দেখেছি, যখন বৃষ্টি নামে তখন বক মাঠে গিয়ে পোকা খায়। মাঠ জলে ভরে যায়। পাখিরা কিচির-মিচির করে। লোকেরা ছাতা মাথায় দিয়ে যায়। কাকেরা কা-কা করে। মাছেরা জলের ভিতর লাফায়। যখন বেশি বৃষ্টি হয় তখন কেউ বার হয় না।

শঙ্খদীপ সেন (বয়স ৫)

ট্যাক্সি

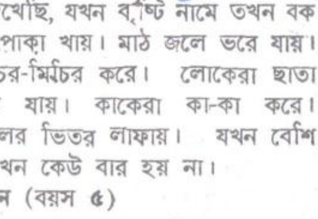

হলদে মাথা
কালো গা—
এই ট্যাক্সি
চলে যা।

অতনু তালুকদার (বয়স ৫)

মেলা থেকে

সেবার আমাদের পাড়ায় একটা মেলা বসেছিল। সেই মেলা থেকে আমি একটা ঘাড়-নড়া বুড়ো ও একটা দোলনা কিনেছিলাম। ঝুলনের দিন ঘরে ঝুলন বসাই। ঘাড়-নড়া বুড়ো তার দারোয়ান হয়।

খরস্রোতা আচার্য (বয়স ৮)

একা তাতুন

উত্তম দাশ

আমার নাম তাতুন চক্রবর্তী। গত মাসের তিন তারিখে আমি পাঁচ বছর পেরিয়ে ছয়ে পড়েছি। আমি তেষট্টি সেন্টিমিটার লম্বা, গত মাসে আমার ওজন ছিল ষোল কেজি চারশো গ্রাম। বাবা প্রতি মাসে আমার ওজন নেন, তিন মাস পর পর আমার উচ্চতা মাপেন। তিন মাস আগে যা ছিলাম তার চেয়ে এখন বোধহয় আর লম্বা হইনি। ওজনেও কমেছি। এক মাসে একেবারে দুই কেজি কম। পনেরো দিন ধরে আমার জ্বর। সন্ধে থেকে কাঁপতে কাঁপতে জ্বর আসে, ভোরের ঠান্ডা বাতাস যখন দক্ষিণ দিকের জানলা দিয়ে গায়ে লাগে তখন বুঝতে পারি আর জ্বর নেই। ঘামে শরীরটা কেমন হিম-হিম লাগে। গায়ের চাদরটা সারারাত আমি গায়ে রাখি না। এই ভর গরমের দিনে জ্বর গায়ে কার ভাল লাগে চাদর চাপা দিয়ে শুতে। মা সারা রাত ধরে চাদর চাপায়, আমি পা দিয়ে ঠেলে ফেলি, মা আবার চাপায়, আমি আবার লাথি ছুঁড়ি। কিন্তু ভোরের দিকে আমি নিজেই চাদর টেনে গায়ে দিই।

এখন দুপুর দুটো। আমি ঘড়ি দেখতে জানি। বাবা শিখিয়েছেন। টেবিলের ওপর মোরগ-ঝুঁটির সেকেন্ডের কাঁটা মাথা নাড়ছে। মোরগ-ঝুঁটির মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা টিক-টিক শব্দ হয়। বিছানা থেকে আমি শব্দটা শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু শব্দ তো বন্ধ হয় না। হলে ঘড়ি বন্ধ। আমি মোরগঝুঁটির নড়া দেখে বুঝতে পারছি ঘড়ি চলছে, টিকটিক শব্দ হচ্ছে। একটু আগে আমার ঘুম ভেঙেছে। দক্ষিণের জানলার পরদা হাওয়ায় উড়ছে। সুহাসীদি মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে ঘুমুচ্ছে। বাবা-মা দুজনেই অফিসে। অন্যদিন আমি এ সময় স্কুলে থাকতাম। ঠিক তিনটের সময় আমায় স্কুল থেকে আনতে যেত সুহাসীদি।

এখানে জানলায় কোনো পাখি এসে বসে না। গাছই নেই তো পাখি থাকবে কোথায়? জানলায় দাঁড়ালে অনেক দূরের দুটো তালগাছ দেখা যায়। আরও দূরে একটা দেবদারুগাছ। আমাদের গ্রামের বাড়িতে অনেক গাছ, অনেক পাখি। সারা দুপুর শুধু কিচিরমিচির, ফুড়ুত ফুড়ুত। চড়ুইগুলো এমন ঘরময় দাপায়, এমন খড়কুটো ছড়ায়। পায়রাগুলো তো সারা দুপুর বকমবকম করবেই। ঘুলঘুলি দিয়ে ঘরের মেঝে নোংরা করবে। এখানে এসব কিছু নেই। একটা কালো বেড়াল শুধু মাঝে মাঝে কোত্থেকে আসে। এলেই সুহাসীদি দুরদুর করে তাড়ায়। কী করে যে বেচারা পালায়! জানলা দিয়ে কার্নিশে লাফিয়ে নামে। নেমে আর ছোটে না। ধীরে ধীরে হাঁটে। সামনের থাবা দিয়ে মুখটা মোছে। একবার কি দুবার ওপর দিকে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে চোখের আড়ালে চলে যায়।

সুহাসীদি ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুচ্ছে। আমার খুব খিদে পেয়েছে। রান্নাঘরে সব-কিছু মিটকেসে তালাবন্ধ। আজকাল অফিসে বেরুবার সময় মা ফ্রিজেও চাবি লাগিয়ে যায়। আমি নাকি অসুখের এই কয়দিনে খুব পাল্টে গেছি। আগে না দিলে কিছুই খেতাম না। সবাই বলে, এখন আমি চুরি করে খেতে চাই। কাউকে না বলে একদিন মাত্র খেয়েছি। ফ্রিজের ডালা খুলে মাটির ভাঁড়ে রাখা দই। দইয়ের পরে ডিম। বাবার জন্যে ডিমের কালিয়া করে রেখেছিল সুহাসীদি। কী ঝাল! সন্দেশ আমি কখ্খনো খাই না। সেদিন খেয়েছিলাম। ফ্রিজ থেকে বোতলের ঠান্ডা জল খেয়ে বিছানায় এসেই বমি। কী টক গন্ধ! দই, ডিম, সন্দেশ সব ছলকে ছলকে বেরিয়ে এসেছিল। সুহাসীদি তো ভয়ে সারা। ভাগ্যিস সেদিন মা তাড়াতাড়ি ফিরেছিলেন। সন্ধেবেলায় ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। বাবার বন্ধু। চাপা গলায় মাকে কী যেন বলেছিলেন, মা বারেবারে আমায় দেখছিলেন—ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে কাঠ।

এখন ঠিক দুটো পনেরো। মোরগঝুঁটি মাথা নাড়ছে। আমি আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামলুম। সুহাসীদির মাদুরের ধার ধরে ধরে দরজার বাইরে এসে একবার পেছন ফিরে তাকালাম। সুহাসীসি ঘুমুচ্ছে। খাবার ঘরের পুবদিকে বাইরে বেরুবার দরজা। কতদিন আমি বাইরে বেরুই না! সামনের ফ্ল্যাটের বাবুন এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। ফিরলেই বা কি? আমার কাছে আর আসে না।

শরীরটা আমার কাঁপছে। দরজার হাতল ধরে দাঁড়াতেই পিনপিন করে সারা গায়ে ঘাম ছুটল। কপালের ঘাম গড়িয়ে বাঁ চোখের পাতা

বেরে একেবারে চোখে। জ্বালা করে উঠল। বাঁ হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছে দরজার হাতল ঘোরালাম। না, এখানে যে চাবি আটকানো নেই। বাইরে পা দিতেই আঃ, সিঁড়ির খোলা জাফরির ফাঁক দিয়ে এমন বাতাস, কতদিন যে এই বাতাসের আমি মুখোমুখি হইনি। দরজাটা ছেড়ে সিঁড়ির হাতল ধরতেই দরজার ইয়েল লক কুট করে বন্ধ হল। সিঁড়ির হাতল ছেড়ে দু পা এগিয়ে আবার দরজার হাতল ধরলাম। হাতল ঘোরালাম। বন্ধ। কী হবে এবার! সুহাসীদির কখন ঘুম ভাঙবে। কখন জানবে আমি ঘরে নেই। যদি মা এসে আমায় বাইরে দেখে। আমার শরীর কাঁপছে।

'তাতুন'। কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। আমি কোনক্রমে মাথা তুলে তাকালাম। কেউ কোথাও নেই। আমার মাথা ঝুঁকে পড়ল।

'তাতুন'। আবার কে ডাকল। আমি আর মাথা তুলে তাকাতে পারছি না। হঠাৎ সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। একটা অস্পষ্ট ছায়া চোখের সামনে ভেসে উঠল। আস্তে আস্তে ঘাড় তুলে তাকালাম। একটা লোক আস্তে আস্তে উঠে আসছে। কাঁধে একটা লম্বা কাপড়ের থলে। কুতকুতে চোখ। আমায় দেখে হাসল। বাবা একবার এরকম একজনের কাছে খবরের কাগজ বেচেছিল। থলের ভেতর থেকে সে আস্তে আস্তে পাল্লা-বাটখারা বের করেছিল। মেপে মেপে কাগজগুলো থলের মুখ, একটু ফাঁক করে ভেতরে ঢুকিয়ে থলেটা পাকিয়ে রেখে গেঁজ থেকে সিকি আধুলি বের করে বাবাকে গুনে গুনে দিয়েছিল। আমার খুব ইচ্ছে করেছিল ওর থলের ভেতরটা দেখতে। অমন পেটমোটা থলেটায় কী রেখেছে ও। কেনই বা থলের মুখ সবটা ও ফাঁক করছে না। বাবা বলেছিলেন ওরা পুরনো কাগজ কেনে। সুযোগ পেলে বাচ্চাদের ওই থলেয় ভরে চুরি করে। তারপর বিক্রি করে দেয় অন্য দেশে।

লোকটা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে এল। আমি প্রাণপণে ডাকলাম, সুহাসীদি।

আমার গলা থেকে শব্দ বের হল না। আমি আবার ডাকলাম, বাবা। আমার গলার স্বর আমিই শুনতে পেলাম না। বুকে তখন কে যেন আবার হাতুড়ি পেটাচ্ছে। জানলার জাফরির ফাঁক দিয়ে আর বাতাস আসছে না। আমি শেষবারের মতো আমার বুকের সমস্ত নিশ্বাস জড়ো করে ডাকলাম, মা।

লোকটা আমার পায়ের কাছে সিঁড়ির ধাপে বসল। থলেটা পাশে নামিয়ে রাখল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসির মতো ঠোঁট দুটো ফাঁক করল। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে ও। সম্মোহনী মন্ত্র। মন্ত্র পড়ে ও আমার মাথায় হাত দিতেই আমি সিঁড়ির ওপর শুয়ে পড়লাম।

ছবি মদন সরকার

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

গাভাসকার অ্যান্ড কোং

অলোক দাশগুপ্ত

ব্রিটিশ পত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফের প্রথম পাতাটা খুলতে গর্বে বুক ফুলে উঠল। তিন কলমের একটি ছবি। সুনীল মনোহর গাভাসকারের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছেন এক দর্শক এবং আরও দুজন গাভাসকারকে বাহবা জানাচ্ছেন। মাঠে ঢুকে খেলোয়াড়দের অভিনন্দিত করা ভারতে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু খোদ ব্রিটেনে একজন ভারতীয় ক্রিকেটার এমনিভাবে বীরপুজা পাবেন ভাবাই যায়নি।

সত্যি, ওভালে সানি গাভাসকারের ২২১ রানের ইনিংসটির জবাব নেই. আট ঘন্টা ২০ মিনিটে ৪৩৮ রান করলে ম্যাচ জেতা যাবে এমনি অবস্থায় ব্যাট করতে নেমে অসাধারণ ধৈর্যশীল এবং কেতাবি গাভাসকার ভারতকে জয়ের দোরগোড়ায় পেঁছে দিয়েছিল। মাত্র নয় রানের জন্য ওভালের চতুর্থ টেস্টে ভারত এক ঐতিহাসিক জয় থেকে বঞ্চিত হল। এই ওভালেই আট বছর আগে ভারত ইংল্যান্ডে তার একমাত্র জয় পায়।

সিরিজের শুরুতে অনেকেই ভেবেছিলেন মাইক ব্রিয়ারলির ইংল্যান্ড ভারতকে গো-হারা হারাবে, এই ভাবার পিছনে যথেষ্ট যুক্তিও ছিল। প্রুডেন্সিয়াল কাপে ভারত যাচ্ছেতাই খেলেছে। অন্যদিকে ইংল্যান্ড বিশ্ব কাপে রানার্স-আপ এবং কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে ৫—১ ম্যাচে সিরিজ জিতেছে।

এজবাস্টনের প্রথম টেস্টে ভারত একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি, ইনিংস এবং ৮৩ রানে ম্যাচটি হারে। লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারত মাত্র ৯৬ রান করেছিল। সবাই ধরেই নিয়েছিলেন ভারত ম্যাচ বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু অসাধারণ ব্যাট করলেন অভিজ্ঞ গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ এবং তরুণ দিলীপ বেঙ্গসরকার। দু' জনেই সেঞ্চুরি হাঁকান—বিশ্বনাথ ১১৩, বেঙ্গসরকার ১০৩।

লর্ডসের লড়াই ভারতীয় দলকে চাঙ্গা করে তোলে এবং বৃষ্টি বিঘ্ন না ঘটালে হেডিংলির তৃতীয় টেস্টে ভারত হয়তো ম্যাচ জিতত। কপিলদেবের দারুণ বোলিং ইংল্যান্ডকে বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মাত্র ৫৮ রানে বয়কট, গুচ, গাওয়ার ও ব্রিয়ারলি আউট—এমনি অবস্থায় বৃষ্টি নেমে টেস্ট প্রায় বানচাল করে দেয়।

ইংল্যান্ড-সফরে কপিলের বোলিংয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে ওর ইন-সুইংগুলো দারুণ কাজ করেছে। চারটি টেস্টে ১৬ উইকেটের দখলদার কপিলই ভারতের সবচেয়ে সফল বোলার।

তবে এবারের সফরকে নিঃসন্দেহে গাভাসকারের সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অনেকে বলতেন গাভাসকার ইংল্যান্ডে মোটেই সুবিধা করতে পারেন না। কিন্তু সুনীল সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন, চারটি টেস্টের সাতটি ইনিংসে ও'র সংগ্রহ ৫৪২ রান, সর্বোচ্চ স্কোর ২২১ (এটি ও'র টেস্ট-জীবনের সর্বোচ্চ স্কোরও বটে) এবং সর্বনিম্ন ১৩। সিরিজ শেষে ৫০টি টেস্টে মোট সংগ্রহ ৪,৯৪৭ রান।

ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকা ওভালে সানির ২২১ রানের ইনিংসটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। 'সান' পত্রিকায় স্টিভ হুয়িটিং লিখেছেন, গাভাসকার নিজেকে জাত ওপেনার প্রতিপন্ন করেছেন। পিটার লেকার 'ডেইলি মিরারে' গাভাসকারকে পৃথিবীর সেরা ওপেনার আখ্যা দিয়েছেন। 'ডেইলি এক্সপ্রেসের' প্যাট গিবসন বলেছেন, কাব্যময় ইনিংস। স্বয়ং গাভাসকার কিন্তু এটিকে সেরা ইনিংস আখ্যা দিতে রাজি নন। ও'র মতে '৭১-এ ওল্ড ট্রাফোরডের ৫৭ রানের ইনিংসটিই ইংল্যান্ডের মাটিতে ও'র সেরা ইনিংস।

গাভাসকার এবং চৌহান ওভালে প্রথম উইকেটে ২১৩ রান যোগ করেন যা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের নতুন রেকর্ড। ১৯৩৬ সালে বিজয় মারচেন্ট এবং মুস্তাক আলি জুটির ২০৩ রান এতদিন ধরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম উইকেট জুড়িতে ভারতের সর্বোচ্চ রান ছিল।

চৌহান এবার ইংল্যান্ড-সফরে মোটেই সুবিধা করতে পারছিলেন না। কেউ কেউ চাইছিলেন ও'কে দল থেকে বাদ দেওয়া হোক। কিন্তু ওভালের দ্বিতীয় ইনিংসে ও'র ৮০ রান একটি সাহসী স্মরণীয় ইনিংস।

চৌহানের মতো বেঙ্গসরকারও গোড়ার

দিকে তেমন সুবিধা করতে না পারলেও পরে নিজের খেলা ফিরে পান। লর্ডস, হেডিংলি এবং ওভালে ওঁকে সফল ভূমিকায় দেখে অনেকেই স্বীকার করেছেন বোম্বাইয়ের দীর্ঘকায় এই ব্যাটসম্যান একজন জাত খেলোয়াড়।

আর গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথকে তো প্রায় সব সিরিজেই সফল ভূমিকায় দেখা যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গাভাসকারের পরেই তাঁর রানের গড় (৩৪১ রান; গড় ৪৮.৭১)। তবে 'আবিষ্কার' হলেন পাঞ্জাবের যশপাল শর্মা। বহুদিন ধরে উনি টেস্টের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন; কিন্তু টেস্ট খেলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। লর্ডস টেস্টে অভিষিক্ত হওয়ার পর থেকেই ব্যাট হাতে নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে চেষ্টা করেছেন। তিনটি টেস্টে ওঁর সংগ্রহ ১০২; সর্বোচ্চ স্কোর ৪০।

মহারাষ্ট্রের যজুর্বেন্দ্র সিংও বেশ সফল-ভাবে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে এলেন। কয়েক বছর আগে টনি গ্রেগের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতে উনি দু'টি টেস্ট খেলেন; কিন্তু ব্যাটিংয়ে তেমন সুবিধা করতে পারেননি। ওভাল টেস্টে দেখা গেল যজুর্বেন্দ্রের ব্যাটিং অনেক উন্নত হয়েছে। আর সোলকারের পর শর্ট লেগে ওঁর মতো দক্ষ ফীল্ডার আর মেলেনি।

বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে ইংল্যান্ড সফর শেষ করে ভারত দেশে ফিরে এসেছে। এই সফর ভারতীয় ক্রিকেটদলকে একটা ব্যালান্সড টীমে পরিণত করেছে। আগে আমাদের বোলিং সর্বতোভাবে স্পিন-নির্ভর ছিল। এখন তিন সীম বোলার—কপিল, ঘাউড়ি এবং মহীন্দার অমরনাথ—যথেষ্ট সফল হচ্ছেন। আর ভারতীয় ব্যাটিং তো গাভাসকার, বিশ্বনাথ ছাড়াও বেঙ্গসরকার, যশপাল, চৌহানদের উপর কিছুটা আস্থা রাখতে পারেই। সবচেয়ে বড় কথা, এবারের ইংল্যান্ড-সফর ভারতীয় দলের মনোবল বাড়িয়েছে যা আগামী টেস্ট সিরিজগুলিতে ভারতকে ভাল খেলতে অনুপ্রাণিত করবে।

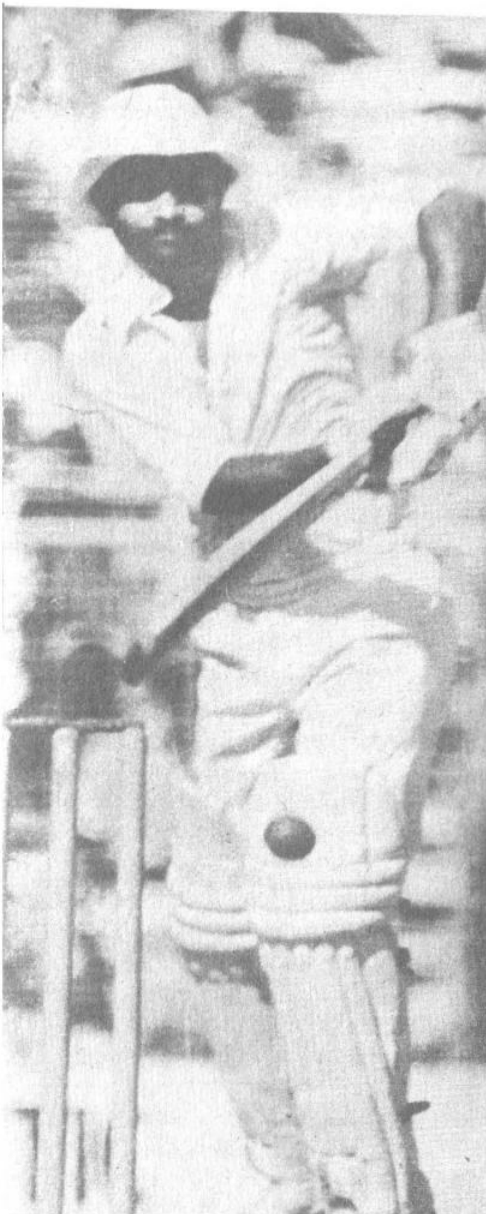

কানপুরে বিশ্বনাথ ব্যাট করছেন
ফোটো তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়-চূড়ায় মোহনবাগান

অশোক দাশগুপ্ত

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং—টানা প্রায় তিন ঘণ্টার মোটর জার্নির পর প্রথম যে ব্যানারটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাতে লেখা ছিল : 'ওয়েলকাম টু ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।' লাল কাপড়ের ওপর হলুদ অক্ষরে লেখা। সেদিন সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরার পথেও ঐ ব্যানারটির দিকে তাকালাম। যদিও, সেই বিকেলেই ইস্টবেঙ্গলকে পরিষ্কার তিন গোলে হারিয়ে গোর্খা ব্রিগেড গোল্ড কাপের ফাইনালে উঠে গেছে জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।

আগের দু'দিনে রাজস্থান এবং জর্জ টেলিগ্রাফকে যথাক্রমে এক এবং পাঁচ গোলে হারিয়ে সেমি ফাইনালে উঠেছে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান।

গতবারের যুগ্ম বিজয়ী কেরালার প্রিমিয়ার টায়ার্সকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিল গ্যাংটকের সিকিম সিভিল সার্ভিস।

কথাটা হল এই যে, ইস্টবেঙ্গল সেদিন খেলেছে নিতান্ত খারাপ। কিন্তু তার মধ্যেই অন্তত দশটি সুযোগ পেয়েছিল— যা থেকে গোল হয়। দার্জিলিংয়ের এই মাঠের মাপ ছোট। একটিও ঘাস নেই। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের খেলোয়াড়দের কড়া ধাতের ফুটবল ইস্টবেঙ্গলের কয়েকজনকে নিষ্প্রভ করে রাখে, তবু অন্তত সাতাশটি সেণ্টার করা হয়েছিল। একা সুরজিৎ সেনগুপ্ত করেন সতেরোটি চমৎকার সেণ্টার, চিন্ময় চ্যাটার্জি ছ'টি, প্রশান্ত ব্যানার্জি তিনটি, এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য একটি। বস্তুত, সুরজিতের পাঁচটি এবং মনোরঞ্জনের সেণ্টার থেকে গোল না করাই ছিল কঠিন কাজ। সাব্বির চারটি এবং ডেভিড দু'টি সোনার সুযোগ হেলায় নষ্ট করেন।

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের পক্ষে অনবদ্য খেললেন উইঙ্গার নরেন্দ্র গুরুং এবং দুই স্ট্রাইকার বালকুমার গুরুং ও বলবিন্দার সিং। গোল করলেন বলবিন্দার সিং, বিজয় সিং এবং নরেন্দ্র গুরুং।

সিকিমের বিরুদ্ধে মোহনবাগান অনায়াসে জিতবে—এই ধারণা নিয়েই দর্শকেরা মাঠে এসেছিলেন। কিন্তু খেলা শুরু হতেই বোঝা গেল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়লেন সাইড ব্যাক প্রেম দোরজি এবং স্টপার তরুণ মুখিয়া।

মোহনবাগানের হয়ে খেলা ধরলেন প্রসূন বানার্জি এবং শ্যাম থাপা। প্রতিরক্ষা মজবুত রাখলেন সুব্রত ভট্টাচার্য এবং শ্যামল ব্যানার্জি।

গোল আর হয় না। খেলা শেষের সাত মিনিট আগে মোহনবাগানের মান বাঁচালেন দার্জিলিংয়ের আইডল শ্যাম থাপা।

ফাইনালে মুখোমুখি হল বাংলা এবং পাঞ্জাবের সেরা দুই টীম। খেলার আগের দিন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের দলনায়ক সুখপাল সিং বললেন, ''গত কয়েক মাসে আমরা জে সি টি, মফৎলাল, ইস্টবেঙ্গল, ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ইত্যাদি বিখ্যাত টীমকে তিন গোলের ব্যবধানে হারিয়েছি। কালই বা জিতব না কেন?''

মোহনবাগান শিবিরেও যুদ্ধের হাওয়া। চব্বিশে সেপ্টেম্বর, সোমবার ফাইনাল। রবিবার বিকেলের মধ্যেই দার্জিলিং পেঁৗছে গেলেন কোচ পি কে ব্যানার্জি।

সোমবার সকাল সাড়ে ন'টায় হোটেল পোলিনিয়ার রোদ্দুর-ভরা ছাদে খেলোয়াড়দের নিয়ে মিটিং করলেন পি কে। সিঁড়ি দিয়ে টগবগ ক'রে নামতে নামতে বিদেশ আর মানস বললেন—আজ জিততেই হবে।

শ্যাম থাপার দুষ্টু ছেলে চিণ্টু দু'হাতে দু'টি টয় রিভলভার নিয়ে তখন মানস-বিদেশদের ভয় দেখাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, ''কী, বাবা আজ গোল করবে?'' চিণ্টু অবশ্য ফুটবলের চেয়ে রিভলভারেই বেশি মনোযোগী মনে হল। ওর হয়ে শ্যামই জবাব দিলেন, ''আজ গোল দেবে মানস আর বিদেশ।''

মানসই একমাত্র গোলটি দিলেন।

কলকাতার সমতলে যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, মোহনবাগান তা অক্ষুণ্ণ রাখল দার্জিলিংয়ের পাহাড়েও। মোহনবাগান এই মুহূর্তে সাফল্য এবং আত্মবিশ্বাসের পাহাড়চূড়ায়।

লেখক হওয়া সহজ নয়

আনন্দ বাগচী

পাছে কথা বলে ফেলি এই ভয়ে লালু আমার দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল রাখল। শিল্পীরা এমনিতেই ভীষণ খেয়ালি হয়, বিশেষ করে যারা রঙ-তুলির কারবার করে, মানে ছবি আঁকে। পান থেকে চুন খসলেই তাদের মেজাজের রঙ নাকি চটে যায়। ওর মানিকদা জাতশিল্পী, আর্ট কলেজের সোনার মেডেল পাওয়া আর্টিস্ট, সব সময় রঙে চুর হয়ে আছেন, একটু বেগড়বাই হলেই কেস পস্তাবে, তখন হাতে-পায়ে ধরেও আর বাগানো যাবে না। এত সব শোনার পরে আমিও খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, কারণ ওর মানিকদাই আমার প্রথম এবং শেষ আশ্রয়। উনি বেঁকে বসলেই আমার ভরাডুবি, একেবারে কূলে এসে।

আমি কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। লালু পর্দা তুলে ভেতরে উঁকি মারল। জষ্টি মাসের ঝিমধরা দুপুর। ছুটির দিন। পুরনো আমলের বিশাল বাড়িটা গোলা পায়রার মতো নাক ডাকাচ্ছে। লালু হাতছানি দিয়ে আমাকে কাছে ডাকল, তারপর খুশিচাপা গলায় বলল, "তোর ফোরটিন পুরুষের ভাগ্যি, নন্দু! কেল্লা মেরে দিয়েছি। মানিকদা হেভি মুডে আছে—"

ভরসা পেয়ে আমি পর্দার ফাঁকে চোখ রাখলাম। চোখ জুড়িয়ে গেল। কাঁচালঙ্কা রগড়ানো, নুনের ছিটে দেওয়া ইয়া টাবলু-টাবলু কালোজাম। লালুর মানিকদা একটার পর একটা সেগুলো মুখস্থ করছেন। বাঁ হাতে শালপাতার কুনকে ঠোঙা, সেটা নুনছাল ওঠা জামে জ্যাম হয়ে আছে। দাদার চোখজোড়া রসালো আমেজে বোজা, মুখের কামাই নেই। থেকে থেকে বেগুনিরঙা জিভটা স্বাদের তারে টকাস শব্দে উঁকি দিচ্ছে, সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে আসার ভঙ্গিতে। বৈঠকখানার গড়াগড়ি খাওয়া ঢালাও ফরাসের ওপর পেট-মোটা লাট্টুর মতো কেতরে আছেন মানিকদা আমাদের। কোমরে চেককাটা লুঙ্গির কষি আলগা, বাঁ বগলের তলায় একটা বাটকুল তাকিয়া, কোলের কাছে সেম সাইজের আর-একটা। ফিতে-বাঁধা ফতুয়ার ওয়াড় পরানো। সেটা নিজস্ব। অবশ্য ভুঁড়ি বলে প্রথম দর্শনে চেনা যায় না।

আমরা দুটিতে গুটি গুটি ভেতরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। পায়ের শব্দে কিছু একটা আঁচ করে মানিকদা জামরঙা চোখ মেললেন। তাঁর মৌতাত কেটে গেল, বোধহয় একটু চমকেও গেলেন। এসময়ে দ্বিতীয় কোনো মনুষ্যমূর্তি সম্ভবত তিনি আশা করেননি। আচমকানিতে

তাঁর হাতের ঠোঙা থেকে গোটা তিনেক জাম জাম্প করল, গদির ওপরে গড়িয়ে পড়ল। করুণ দৃষ্টিতে আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "আরে লালমুউনে যে।" মুহূর্ত কয়েক মুখ সামলাতে সময় নিয়ে ফের বললেন, "তাপ্পর এ সময়ে কিসের ধান্ধায়?"

"খুব বিপদ।" বলেই লালমোহন আমাকে চিমটি কাটল, "এই বল না?"

ঢোক গিলতে না গিলতে আমার মুখে জল এঁসে যাচ্ছিল, জামের কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললাম "উঃ! মলাট।"

মলাটের সঙ্গে লালুর চিমটিঘটিত উঃ মিশে গিয়ে মানিকদার কাছে ব্যাপারটা আরও দুর্বোধ হয়ে উঠল। জামের ঠোঙা গদির ওপর নামিয়ে রেখে তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। লালুই অবশ্য শেষরক্ষা করল। বলল, "এই আমার বন্ধু নন্দর বই, ছাপা হচ্ছে; আপনাকে একখানা মলাট এ'কে দিতে হবে।"

সন্দেহ আর তারিফের চোখে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মানিকদা অট্টহাসি করে উঠলেন, "ওঃ এই ব্যাপার! আমি ভাবলাম না জানি কী হল। নে, হাত লাগা।" নিস্পৃহ ভঙ্গিতে জামের ঠোঙার দিকে হাতের ইশারা করলেন।

টকাটক কয়েকটা জাম তুলে নিয়ে লালু আমাকে ভেংচি কাটল, "কী রে বলিনি, মলাট-ফলাট মানিকদার বাঁ হাতের কাজ!"

"থামো থামো।" মানিকদা লালুকে কথায় আর কাজে দুতরফেই থামিয়ে দিয়ে ঠোঙাটা ছোঁ মেরে আবার তুলে নিলেন, "অত সহজ নয় যা ভাবছ। মলাট বললেই মলাট হয় না! কী মলাট, কেমন মলাট, কিসের মলাট আগে সব জানতে হবে। ক'রঙা, কী সাইজ। হাফটোন না লাইন-স্ক্রীন? গপ্পের বই, তো গপ্পটা শুনতে হবে আগাপাশতলা। নাও, তুমিও দুটো নাও, রাইটার বলে কতা!"

এর আগের একটা ইতিহাস আছে, খুব সুখের নয় যদিও, তবু সেটা তোমাদের জানা দরকার। সে আমার প্রথম লেখক হওয়ার কাহিনী। হায়, লেখক হওয়া যে কী ঝকমারির কাণ্ড তখন কি আর জানতাম! তখন থার্ডক্লাসে পড়ি, মানে ক্লাস এইটে। ইশকুলের লেখা-পড়া তো শিকেয় উঠেছে, অষ্টপ্রহর হাবুডুবু খাচ্ছি গপ্পের বইয়ে। কষকষে রগরগে হাজার দেড়েক বই গোগ্রাসে গিলে সাবাড় করে ফেলেছি। রহস্য, রোমাঞ্চ, বিভীষিকা, অ্যাডভেঞ্চার—তার মধ্যে কী নেই! গুলি-বারুদ-খুন-জখম, ঝানু গোয়েন্দা আর ঘাগু অ্যাসিস্ট্যান্টের পিলে চমকানো, বুকে পিং-পং লাফানো লোমখাড়া করা সব বই। সেসব হজম করতে গিয়েই গণ্ড-গোল, মাথা রীতিমত ছিটেল হয়ে উঠেছে। নিজে হাতে খান তিনেক বইও লিখে ফেলেছি সদ্য-সদ্য। প্রতিভা তো গোপন থাকে না, ইশকুলময় চাউর হয়ে গেছে আমার কীর্তি-কলাপ। বন্ধুমহলে আমি রাতারাতি এবং রীতিমত সাহিত্যিক বনে গেছি। আমার তখন খ্যাতির ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। বই ছাপা না হলে আর ইজ্জত থাকে না! ক্লাসের বন্ধুদের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত পথে নামতে হল। কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়া অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। নতুন শিং গজানো বাছুরের মতো প্রকাশকদের দরজায় ঢুঁ মেরে চললাম।

চাঁদিফাটানো রোদ্দুরে একটা দুপুর ঘুর-পাক খেয়েই সারসত্য বুঝে গেলাম, বই লেখার চেয়ে বই ছাপানো কতগুণ শক্ত। ফুটো বেলুনের মতো মুখ আমশি করে ফিরছিলাম। স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, খুঁড়িয়ে হাঁটছি, জামা-কাপড় বিধ্বস্ত। ঘামে জবজবে বগলে মিয়োনো পাঁপড়ের মতো তিনখানা এক্সারসাইজ খাতা। খিদেয় তেষ্টায় ক্লান্তিতে মনে হচ্ছে রাস্তার ওপরেই শুয়ে পড়ি। বিকেল গড়িয়ে গেছে, গ্যাস-বাতিগুলোও একে একে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। আর ঠিক এমনি মুহূর্তে দেখা হয়ে গেল 'বঙ্গশ্রী' মোহিতদার সঙ্গে। বিশাল মোটর-সাইকেলখানা ঠেলতে ঠেলতে আসছিলেন, বোধহয় তেল ফুরিয়ে গেছে। মোহিতদা ব্যায়ামবীর, আমাদের পাড়ায় থাকেন। ডাম্বেলের গোলার মতো তাঁর হাতের গুলি, পা দুখানা উল্টে রাখা পালোয়ানি মুগুর, শরীরের সমস্ত মাংসপেশী তাঁর পোষমানা। ইচ্ছে করলে কান দুটো নাচাতে পারেন, দাঁতে চেপে ইয়া মোটা মোটা লোহার পাত বাঁকিয়ে দেন।

আমার কাকতাড়ুয়া মূর্তি দেখে মোহিতদার করুণা হল। জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, কী হয়েছে? তোর এই হাল কে করল?"

আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না, চিঁ চিঁ করে বললাম, "প্রকাশক।"

"কে?" হুঙ্কার দিলেন মোহিতদা, 'কোন

পাড়ায় থাকে শুধু বল!'' পাড়ার ছেলেদের প্রতি স্নেহে অন্ধ মোহিতদা বোধহয় ভেবেছিলেন বেপাড়ার কোনো ছেলে আমাকে মেরেছে। সংক্ষেপে আমার করুণ কাহিনী ওঁকে বললাম। সব শুনে মোহিতদা যাকে বলে একেবারে মোহিত। বললেন, "তুই লিখিস জানতাম না তো! কই দেখি, দেখি?''

খাতাগুলো হাতে তুলে দিলাম। কোনো আশ্চর্য বস্তু দেখছেন এমনিভাবে পাতার পর পাতা ওলটাতে লাগলেন আর স্বগতোক্তি করে চললেন, "তুই লিখেছিস এগুলো! নিজে লিখেছিস? নিজে একা লিখেছিস, অ্যাঁ? ঠিক হ্যায়, একঠো কিতাব হাম অবশ্যই ছাপেগা—''

জীবনে অনেক মধুর হিন্দি কথা আমি শুনেছি, কিন্তু মোহিতদার মুখনিঃসৃত সেই হিন্দি বাণীর তুলনা হয় না। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।

এরপরের অংশটুকু আর কথা নয়, কাজ। পেট্রল পাম্পে তেল নিতে যাবার কথা ভুলেই গেলেন মোহিতদা। তাঁর বিশাল ভটভটির ওপরে আমারে চাপিয়ে ঠেলতে ঠেলতেই নিয়ে গেলেন একটি প্রেসে। তারপর ধোপার বাড়িতে দেবার ময়লা জামাকাপড়ের পুঁটলির মতো আমাকে প্রেসের মালিকের হাতে উচ্ছুগ্যু করে কেবল বললেন, "এ আমার পাড়ার রাইটার! এর একখানা বই তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে বের করে দাও।''

ব্যস, কথাটি বলেই মোহিতদা দরজার দিকে পা বাড়ালেন। বিপদের পরিমাণটা আঁচ করে নিয়ে প্রেসের মালিক শ্রীযুক্ত করঞ্জাক্ষ বর্ধন কাতর গলায় ডাকলেন, "এই মোহিত, শোন, শোন, শুনে যা—''

মোহিতদা দাঁড়ালেন না, যেতে যেতে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলে গেলেন, "আমি কিছুই শুনব না, একেবারে বই দেখব। এক মাসের মধ্যে।''

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে করঞ্জাক্ষবাবু বললেন, "নাঃ, ব্যবসাপত্তর দেখছি তুলেই দিতে হবে। এ কি ছেলেখেলা নাকি?" পাকা করমচার মতো চোখ দুটো পাকিয়ে আমার দিকে তাকালেন। কী আর জবাব দেব, চুপ করেই থাকলাম।

"হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'' করঞ্জাক্ষ খেঁকিয়ে উঠলেন, তারপর পাশের টুলটা দেখিয়ে বললেন, "বসো। বস্তুটি বের করো।"

দুরু দুরু বুকে আমার পছন্দসই খাতাখানা ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। খাতা খুলেই ও'র মেজাজ আবার তিরিক্ষি, "কোত্থেকে লেকা শিখেছ? এক পৃষ্ঠায় লিখতে হয় জানো না?"

পাতার সংখ্যা দেখে বিড়-বিড় করে কীসব হিসেব করলেন, তারপর বললেন, "প্রুফ দেখতে জানো তো? অ্যাঁ, জানো না! বাঃ বাঃ, তাহলে তো হয়েই গেল। এ বই আর ইহজম্মে বেরোবে না।'' আমার দিকে টেবিলের ওপরে খাতাখানা ছুঁড়ে দিয়ে উনি নিজের কাজে মন দিলেন। আমার মুখে বাক্যি নেই। সত্যি বলতে কী প্রুফ কী বস্তু তাই জানি না। বই ছাপা যে এত দুষ্কর, তাতে যে পদে পদে এত গেরো তা জানলে কোন্ আহাম্মক আর বই লিখতে যায়।

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে থেকে খাতাটা তুলে নিয়ে উঠে আসছি। করঞ্জাক্ষ হুঙ্কার ছাড়লেন, "পালাচ্ছ কোথায়! আমার বারোটা তো বাজিয়েই দিয়েছ, এবার তোমার মুরুব্বি আমার জান কয়লা করে দিক এই তো চাও? ওটি হচ্ছে না! শোনো, আমার প্রেসের নিয়ম অথর তার বইয়ের প্রুফ নিজে দেখবে।" বলেই ড্রয়ার থেকে একটা মোটা বই বের করলেন। বইটার নাম প্রিন্টার্স গাইড। পায়ের কাছের বেতের ঝুড়িটা থেকে এক তাড়া কাটা প্রুফ তুলে আমাকে দিলেন, "নাও হাতে কলমে শিখে নাও। দুদিন সময় দিলাম।"

এইভাবে প্রাণের দায়ে প্রুফ দেখতে শিখলাম। করঞ্জাক্ষদা মানুষটা খারাপ নন, তিনিও আমাকে সাহায্য করলেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্রুফ দেখা চলেছে, বই ছাপাও কিছু দূর এগিয়েছে, একদিন আমাকে ডেকে বললেন, "শিল্পী-টিল্পি চেনা আছে? একখানা মলাট আঁকতে হবে, পয়সা কিন্তু দিতে পারব না বাপু।''

এই ইতিহাসের সূত্র ধরেই মানিকদার কাছে আসা। এবার আমার মুরুব্বি লালমোহন ওরফে লালু। তিন-তিনটে দুপুর মানিকদা চক্ষু বুজে গল্প শুনে গেলেন। একই গল্প বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। সেই সঙ্গে তাঁর মুখ চলল সমানে। আমারই চোখের সামনে নানা রকম ডিশ ফাঁকা হয়ে গেল। অবশেষে মানিকদা স্থির করলেন তিনি একটা মোক্ষম খুনের ছবি আঁকবেন। খুনের ছবি, তাই তাকে রিয়্যাল হতে হবে। সেই ফোর্স, সেই ফিলিং

আনতে হবে। অতএব আমাকে মডেল করে তিনি ছবি আঁকবেন। আমাকে তাঁর সামনে সিটিং দিতে হবে।

সুতরাং সিটিং দিতে গেলাম। সেটাকে সিটিং না বলে হাফ হামাগুড়ি, হাফ নীল-ডাউন বলাই ভাল। একটা গোটা দুপুর ধরে আমাকে নিয়ে ভয়ঙ্কর কসরত চলল। বদরাগী নাপিত, খিটখিটে ফোটোগ্রাফার আর অতি খুঁতখুঁতে সিনেমা-পরিচালক—এই তিন ব্যক্তি একসঙ্গে হয়েও হয়তো একটা মানুষকে অতখানি টর্চার করতে পারত না। মানিকদা একাই আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশিই ঘায়েল করলেন। সেদিন আমার দুটো ভূমিকা ছিল। আমিই নিহত লোক, আবার আমিই তার হত্যাকারী। ফ্লেকসিবল টেবল ল্যাম্পের নলের মতো আমার ঘাড় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে ঘণ্টা-ঘণ্টা ভর রেখে আমাকে অ্যায়সা মডেল বানালেন যে, বাড়ি ফিরে দিন তিনেক ফিকব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম।

কদিন পরে মানিকদার বাড়ি যেতেই তিনি পাতলা কাগজে প্যাক করা ছবির মোড়কটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললেন, "নাও তোমার ছবি রেডি। ওয়াণ্ডারফুল হয়েছে। আমার নামটা ছাপতে যেন ভুলো না। মানিকচন্দ্র হুই।"

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে করঞ্জাক্ষদার কাছে চলে গেলাম। প্যাকেট খোলা হলে ছবি দেখে আমি থ হয়ে গেলাম। দুটি বিশালকায় মানুষ একটা প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর মরণ-আলিঙ্গনে জাপটাজাপটি করছে। একজনের হাতে একটা রক্তমাখা ছোরা। যে টেবিলটার ওপর মডেল হয়ে আমি কসরত করেছিলাম সেটা চিনতে পারলাম। আর একটা ব্যাপার খুব চেনা লাগল। ওই প্রমাণ সাইজের লোক দুটোর পরনে দুটো খাটো হাফপ্যান্ট, সেদিন আমি যা পরেছিলাম। এছাড়া আর কোনো মিল নেই।

"ছি ছি, এ কী হল করঞ্জাক্ষদা!" মাথায় হাত দিয়ে আমার তখন বসে পড়ার অবস্থা, "কী হবে এখন?"

"মারো গুলি!" খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন করঞ্জাক্ষদা, "ফাস্ কেলাস জমবে, একেবারে জ্যায়সা কা ত্যায়সা! অথরের বয়সটা অন্তত আন্দাজ করা যাবে।"

গান শেখা

সুশীলকুমার গুপ্ত

গান শেখা সোজা নয়,
চাই জোর চর্চা ;
তারপর বহুবিধ
জিনিসের খরচা।
খাবি দিনে পাঁচ কুড়ি
কোকিলের ডিম্ব,
এক কেজি খাঁটি মধু,
তেরটি দাড়িম্ব।
দেখবি নিজেরই স্বর
কী-রকম মিষ্টি
শ্রোতা সব গিলে খাবে,
রসঘন দৃষ্টি।
মালিশ করবি রোজ
চিটেগুড়ে কণ্ঠ,
রাঁধবি যত্নে তাল
কেটে সুরঘণ্ট।
সুরকে বাগাতে শেখ
জুজুতসু কসরত,
তাই ডনবৈঠকে
ভাল কর তবিয়ত।
গণিতে দখল চাই
স্বরলিপি পড়তে,
জমাবি পাখির স্বর
ঘরানাকে গড়তে।
হ'তে পারি গুরু তোর
দক্ষিণা যদি দিস ;
পরাব মাথায় সেরা
গায়কের উষ্ণীষ।

সাধারণ পরিষ্কার করার পাউডার ব্যবহার করার পর
কিছু অবশিষ্ট গুঁড়ো থেকে যাওয়া সম্ভব

ভিম আনে নিখুঁত ঝলমলে চমক!

এর মধ্যে আছে দেড়গুণ পরিষ্কার করার ক্ষমতা

ভিমে আছে পরিষ্কার করার যে কোনো পাউডারের চেয়ে বেশী ডিটারজেন্ট। তাই এর বাড়তি পরিষ্কার করার ক্ষমতা—তেলাভাব আর সমস্ত দাগ নিমেষে সাফ করে দেয়, কোনো গুঁড়ো অবশিষ্ট রাখে না।

তা ছাড়া **ভিম** অতি-মিহি ও মোলায়েম হওয়ার ফলে পরিষ্কারও ভালো হয় অথচ আঁচড় পড়ে না। **ভিম** ব্যবহারে সব কিছু ঝলমলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আপনার ২৫% দাম বাঁচবে এই প্যাক কিনলে

হিন্দুস্থান লিভারের এই উৎকৃষ্ট উৎপাদন কেবল ৬০০ গ্রা: ও ২.৫ কেজি প্যাকে পাওয়া যায়, কখনও খোলা বিক্রী হয় না।

লিনটাস-V.56-2115 BG

সেণ্ট লরেন্স

দিদিমণি

সেণ্ট লরেন্স নদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা রাজ্যের সেণ্ট লুইস নদী থেকে আরম্ভ হয়েছে, তারপর পাঁচটি হ্রদের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে কানাডার ক্যাবট প্রণালী পার হয়ে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গেছে। লম্বায় এই নদী ২,৫০০ মাইল। এই নদীটি উত্তর আমেরিকার একটি প্রধান জলপথ। প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য চলে এই জলপথ দিয়ে। এই নদীর গতিপথকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে আছে হ্রদ অঞ্চল—উত্তর আমেরিকার বৃহৎ পাঁচটি হ্রদ। এই হ্রদগুলি সেণ্ট লরেন্স নদী দিয়ে যুক্ত হয়েছে। কিংস্টন শহরের কাছ থেকে কুইবেক শহর পর্যন্ত এই নদীটির গতিপথ সাধারণ আর-পাঁচটা নদীর মতোই। তারপর থেকে ক্যাবট প্রণালী পর্যন্ত নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ও নোভাস্কোশিয়ার মধ্যে নদীটি চওড়া হয়ে গেছে। তখন প্রথমে এর নাম হয়েছে সেণ্ট লরেন্স খাড়ি, তারপরে সেণ্ট লরেন্স উপসাগর।

এই নদীর গতিপথ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। মিশিগান ও হিউরান হ্রদ ছাড়া অন্য হ্রদগুলির উচ্চতা একই সমতলে নয়। সুপিরিয়ার হ্রদটি সবচেয়ে পশ্চিমে। এইটিই সবচেয়ে গভীর হ্রদ এবং সেন্ট মেরিজ নদী দিয়ে হিউরান হ্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সুপিরিয়ার হ্রদের দক্ষিণে আছে মিশিগান হ্রদ। এই হ্রদের জল উত্তর দিকে ম্যাকিন্যাক স্ট্রেটের মধ্যে দিয়ে হিউরান হ্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হিউরান হ্রদের জল সেণ্ট ক্লেয়ার নদীর সাহায্যে সেণ্ট ক্লেয়ার হ্রদে এবং সেণ্ট ক্লেয়ার হ্রদের জল ডেট্রয়েট নদীর সাহায্যে ইরি হ্রদে এসে পড়েছে। ইরি হ্রদের জল নায়েগ্রা নদীর মধ্যে দিয়ে অণ্টারিও হ্রদে এসে পড়ছে। ইরি ও অণ্টারিও হ্রদের মধ্যে আছে বিশ্ব-বিখ্যাত নায়েগ্রা জলপ্রপাত। ইরি ও অন্টারিও হ্রদের উচ্চতার তফাতের জন্যেই এই জল-প্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে।

যদিও বিভিন্ন নদীর নাম দিয়ে একটি হ্রদ অন্য হ্রদটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তবুও সম্পূর্ণ জলপ্রপাতটিকেই সেন্ট লরেন্স নদী বলা হয়।

হ্রদ অঞ্চল ছাড়িয়ে এসে কিংস্টন থেকে মণ্ট্রিয়ল শহরের মধ্যে নদীপথে অনেক জায়গায় খরস্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যে অনেক জায়গায় খাল-পথের সাহায্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কুইবেকের কাছে নদীতে অনেকগুলি দ্বীপ আছে। মণ্ট্রিয়ল শহর বিশাল বন্দর হয়ে ওঠায় নদীর জল অনেক ক্ষেত্রেই দূষিত হয়ে গেছে। শীতকালে অবশ্য সেণ্ট লরেন্স নদীর ধারের এই বিশাল বন্দর বরফ জমে বন্ধ হয়ে যায়। তখন বরফ-ভাঙা ছোট ছোট জাহাজের সাহায্যে কোনোরকমে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া হয়। সেণ্ট লরেন্স খাড়ির উচ্চভাগে কুইবেক পর্যন্ত জোয়ারের জলের সাহায্যে নদীর জল পরিষ্কার থাকে। কিন্তু শীতকালে এখানেও বরফ জমে থাকে। মণ্ট্রিয়লের কাছে এসে মিশেছে ওটাওয়া উপনদী। খাড়ির নীচের দিকে, যেখানে মাগুয়েনে উপনদী এসে সেণ্ট লরেন্স নদীতে মিশেছে, নদীর জলের গভীরতা খুব বেড়ে গেছে। সেণ্ট লরেন্স নদীর খাড়ি যেখানে সমুদ্রে এসে মিশেছে, সেখানে এই নদী ৫০ মাইল চওড়া। নদীর জলে সমুদ্রের জলের লবণ মিশে যাওয়ার জন্যে বরফ জমে কম।

এই নদীতে নানারকম মাছ পাওয়া যায়। নদীর দু ধারে অনেক রকম পাখি আছে। দুই তীরে পাতা-ঝরা গাছের বনও দেখতে পাওয়া যায়—কোথাও কোথাও সরলবর্গীয় অর্থাৎ পাইন জাতীয় গাছও দেখতে পাওয়া যায়। মাঝে-মাঝে নদীর তীরে ঘাসও দেখা যায়। জলপথ হিসেবে সেণ্ট লরেন্স নদীকে খুব বেশি ব্যবহার করা হয়। গরমকালে এই জল-পথের সাহায্যে উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগ পর্যন্ত জাহাজ চলাচল করতে পারে। অনেক জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রও তৈরি করা হয়েছে। হ্রদ অঞ্চলের লোহা এবং কানাডার তৃণভূমি-অঞ্চলের গম এই হ্রদগুলি ও সেণ্ট লরেন্স নদীর মধ্যে দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয়।

বাঘা ১

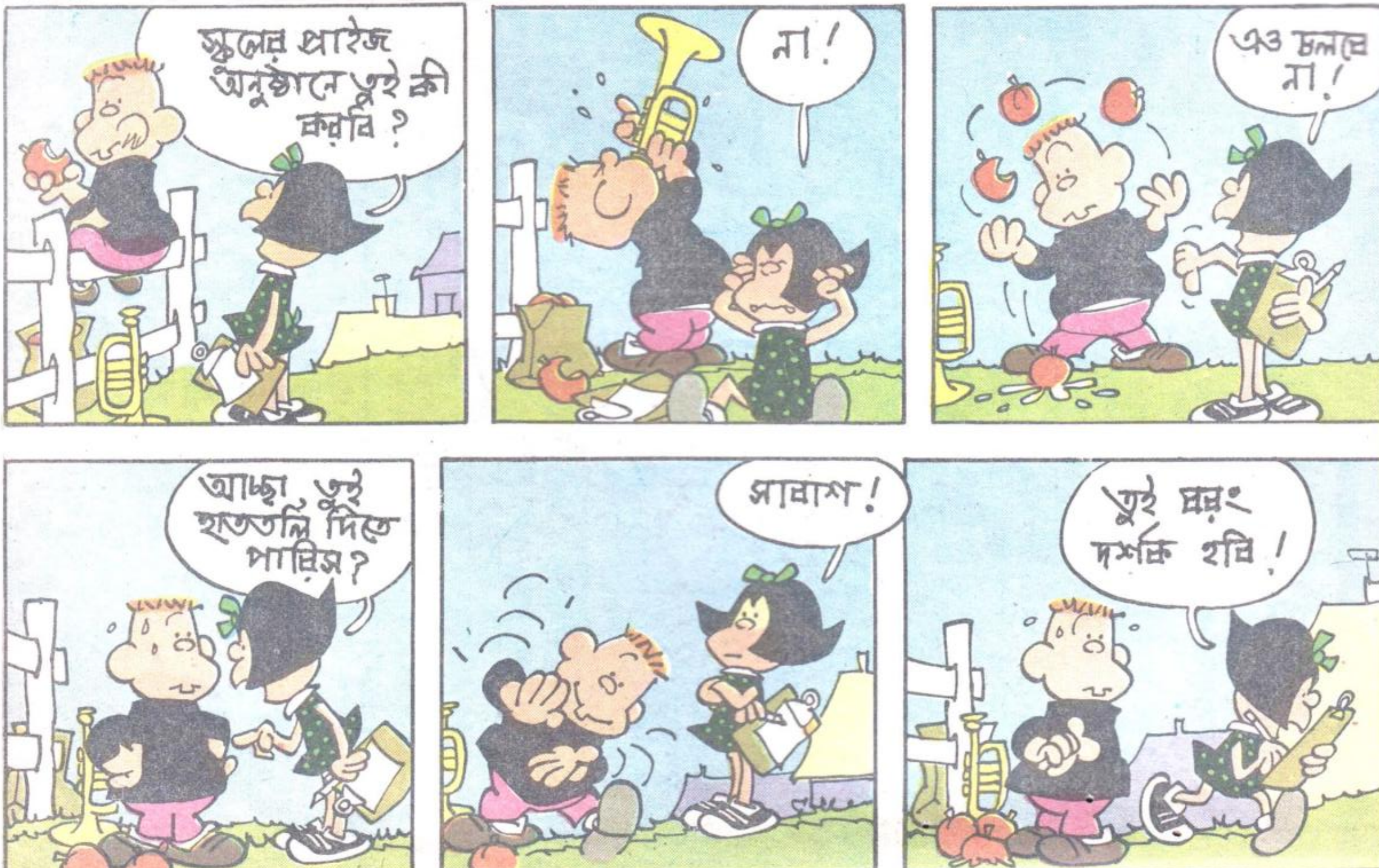

স্কুলের প্রাইজ অনুষ্ঠানে তুই কী করবি?
না!
এও চলবে না!
আচ্ছা, তুই হাততালি দিতে পারিস?
সাবাশ!
তুই বরং দর্শক হবি!

এই নে কুত্তা, বিস্কুট খা!
এবার আমাকে পড়তে দে!

যূথীর তারা

অরূপরতন ঘোষ

দাদা নাকি আকাশের তারা হয়ে গেছে। ছাদে উঠে যূথী ঘন নীল রাতে তারাটাকে কত খোঁজে। মাকে বলে, "মা, দেখিয়ে দাও না কোন্ তারাটা আমার দাদা!''

মা হঠাৎ চুপ করে যায়। সব সময় মা-র হাতের চুড়ি টুনটুন শব্দ করে বাজে। সেই সময় তাও থেমে যায়। অন্ধকার রাতে হাওয়ার ওপরে ফোটা তারাদের নীচে থাকে যূথী আর তার মা। বন্ধ ঘড়ির কাঁটার মতো মা স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়। একটা সুন্দর গন্ধ আসে মা-র শরীর থেকে। চুইংগামের মতো ঠান্ডা মিষ্টি সেই গন্ধ রাতের হাওয়ায় ভেসে ভেসে তারা-হয়ে-যাওয়া যূথীর দাদাকে ছুঁয়ে আসে। মাঝে মাঝে এই রকম হয়, তখন খুব তাড়াতাড়ি রাত্তির বেড়ে ওঠে।

ভোর! জানলা দিয়ে দাদার ছবির ওপর রোদ্দুর পড়েছে। যূথী বিস্কুট খেতে খেতে ছবির চোখের দিকে তাকাল। দাদা কিন্তু ওর দিকে তাকাল না। ফোটোর লোকেরা কখনো চোখে চোখ রাখে না। সবসময়ই অন্যমনস্কের মতো চেয়ে থাকে।

"যূথী, যূথী--'' ও-বাড়ির মিল্টুন ডাকছে। কাল ও আর মিল্টুন একটা পোড়ো-বাগানে ঢুকে, বুড়ো পুরনো একটা কাক-তাড়ুয়ার নীচে বসেছিল। বসে বসে সমুদ্রের গল্প করছিল। মিল্টুনরা পুরীর সমুদ্রের ধারে কী মজা যে করেছিল না!

"যূথী, যূথী—" মা ডাকছেন ওমলেট খাওয়ার জন্য।

"যূথী, যূথী—'' বাবা ডাকছেন পড়তে বসার জন্য। যূথী ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খাটের নীচে রাখা যূথীর ছোট্ট পুতুল মিতু সামনের দিকে দু হাত তুলে মৃদু স্বরে ডেকে উঠল, "যূথী, যূথী—।''

কেউ শুনতে পেল না। মিতু দু হাত তুলেই রইল সারাদিন...সারারাত। রাত্তির ন'টা থেকে দশটার মধ্যে কোনো-এক সময় যূথী ঘুমিয়ে পড়ল। চোখের মধ্যে টলমল করে উঠল অন্ধকার, তারপর আস্তে আস্তে একটা শান্ত সাদা রঙ এল। সুন্দর সাদাটা নীলচে হয়ে গেল। যূথী দেখল কয়েকটা তারা এসেছে ওদের জানলার কাছে। তারাগুলো মিটমিট করছে। একটা তারা ছলছল করছে খুব। সেটা থেকে টুপ করে এক ফোঁটা আলো খসে পড়ল। আলোর ফোঁটাটায় ঝলমল করছে জল। শাঁ করে মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। নীচের দিকে আকাশ যেখানে মাটি আর গাছের সঙ্গে

মিশেছে সেখানটা আলোয় একটুখানি ঝাপসা হয়ে উঠল। তারাটা থেকে একটা সোনালি দুঃখ আলোয় টলমল করতে করতে বাতাসে ভেসে গেল। আকাশের নীচের দিকটা আরও একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন নীল ডিমলাইট জ্বলছে গাঢ় সবুজ অন্ধকারে। দূরে দিগন্তের কাছে কিছু পাতা চিকচিক করছে। উঁচু আকাশে তিনটে তারা। একটা তারা যূথীর দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ খসে পড়ল। পাশের দুটো তারা ঝিলমিল করে উঠল, সুমন কাঁদিস না, ঝরে যাস না, আমাদের কাছ থেকে চলে যাস না।

টুকটুকে আলোটা মিলিয়ে গেল। আকাশে কে যেন ঠান্ডা রঙ লাগিয়ে দিল। কমলালেবুর কোয়া ছিঁড়ে ভিতরের রঙে মিষ্টি হয়ে উঠল পূবদিকের আকাশ। যূথীর মন কেমন করে উঠল। সুমন তো ওর দাদার নাম, দাদা তারা হয়ে কেঁদে কেঁদে ঝরে যাচ্ছে। দাদার কি খুব কষ্ট হচ্ছে। ভোর হয়ে এল। পূবদিকে ডিমের কুসুম ভাঙছে।

সারা আকাশটা আলোয় ডুবে গেছে। যূথীর ঘুম ভেঙে গেল। এখনো বেশ অন্ধকার। না, অন্ধকার তো নয়, ভোর হয়ে গেছে। কিন্তু তারা তিনটে এখনো ফুটে আছে! না, নেই তো! যূথী জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখল দুটো তারা যেন পাতলা সাদা কাগজের তৈরি ফিকে ফিকে, আরো ফিকে হয়ে গেল।

সারা মাঠে ফোঁটা-ফোঁটা জল-শিশির পড়ে আছে। যূথীকে কে যেন ইঞ্জেকশনের ছুঁচ ফুটিয়ে দিল। বুকের ভেতরটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। সারাটা রাত ধরে এরা নিশ্চয়ই দেখেছে কী ভাবে তারা ঝরে ঝরে ভোর হয়ে এল। জলের ফোঁটাগুলো হয়তো তারা-ঝরা জল, সকলে শিশির বলে জানে! যূথী আকাশের দিকে তাকাল, কিছু বুঝতে পারল না!

কেউ দেখতে পেল না যূথীদের বাগানে ফুলের একটা কুঁড়ি একটু ফুটে উঠল, তারের ওপর একটা শালিক বহুক্ষণ বসে বসে কখন উড়ে চলে গেছে। খাটের নীচে মিতু এখনো সামনের দিকে দুটি হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদু স্বরে বলছে, "যূথী, যূথী—"

কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

ছবি মদন সরকার

ছবির মজা

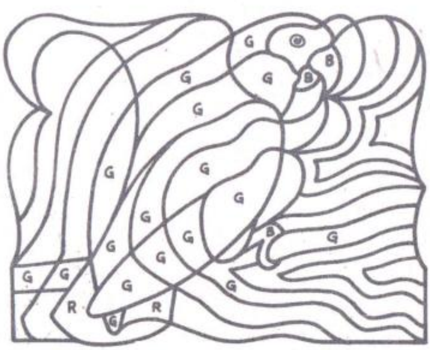

উপরে যে নকশা দেখছ, তার মধ্যে একটা পাখি লুকিয়ে আছে। নকশার জি-চিহ্নিত জায়গাগুলো গ্রীন অর্থাৎ সবুজ, বি-চিহ্নিত জায়গাগুলো ব্ল্যাক অর্থাৎ কালো, আর আর-চিহ্নিত জায়গাগুলো রেড অর্থাৎ লাল পেন্সিল দিয়ে ভরাট করলেই সেই পাখিটা তুমি পেয়ে যাবে।

হামটি ডামটির ছড়া তো পড়েছ। এই সেই হামটি ডামটি। রঙিন পেন্সিল দিয়ে একে ভরাট করো। তার আগে ভেবে নাও, কোথায় কোন্ রঙ দিলে মানায়।

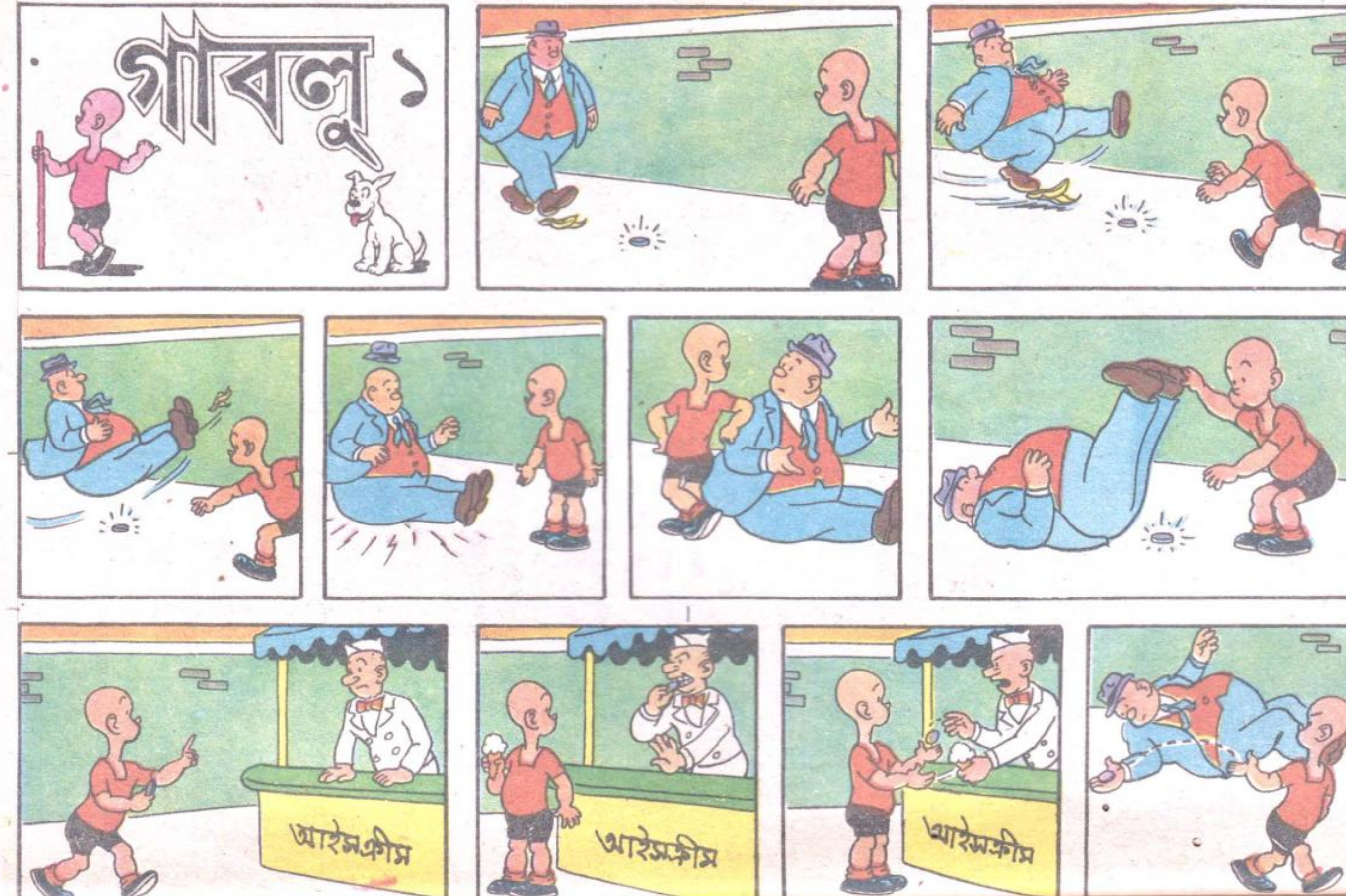
গাবলু ১
আইসক্রীম
আইসক্রীম
আইসক্রীম

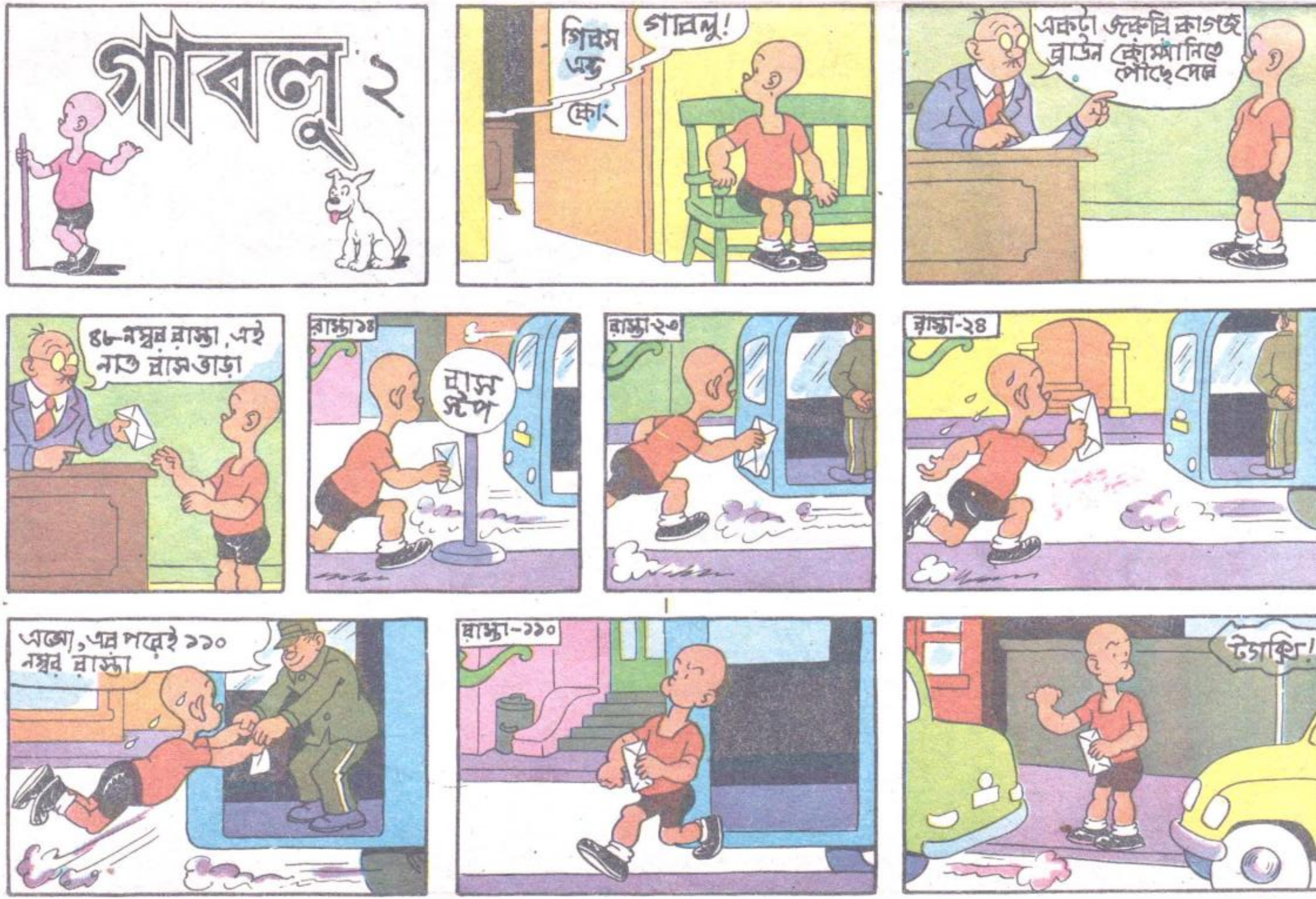
গাবলু ২
গিবস এন্ড কোং
গাবলু!
একটা জরুরি কাগজ ব্রাউন কোম্পানিতে পৌঁছে দেবে
৪৮-নম্বর রাস্তা, এই নাও বাসভাড়া
রাস্তা১৪
বাস স্টপ
রাস্তা২৩
রাস্তা-২৪
এসো, এর পরেই ১১০ নম্বর রাস্তা
রাস্তা-১১০
ট্যাক্সি!

সিঁড়ির ধাপ, আরও
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সব দিকের সিঁড়ি পেলেও পুরো-ধাপ-দেখতে-পাওয়া সিঁড়ি এখন আঁকা হয়নি। নমুনা লক্ষ করলেই তা পাবে। ১নং সিঁড়ির ধাপের পাশে ২নং সিঁড়ির ধাপ বসাও একটু নামিয়ে। এবার ১নং ও ২নং সিঁড়ি দুটির ধাপে ধাপে যোগ দিলেই ৩নং ছবির মতো পুরো-ধাপ-দেখা সিঁড়ি পাবে। দুটি ধাপ জোড়ার সময় ১নং ধাপের "ক"চিহ্নিত লাইন দুটি মুছে ফেলতে ভুলো না।

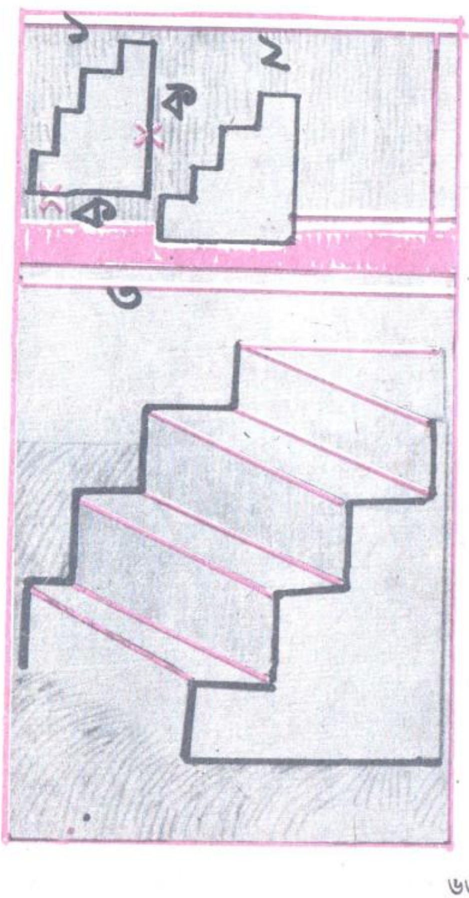

বাঁশের কাজ—পুতুল ঘোড়া
কারিগর

জোগাড় করা জিনিস দিয়ে শুরু করো। প্রথমে মোটা বাঁশ (গিঁট সমেত) মাপমতো ওপর-নীচ সমান রেখে কাটো। এবার নীচের অংশ থেকে চারটে পায়া বার করো। ("গ'' ছবি)। গলার জন্যে কম মোটা বাঁশ নিয়ে "ঙ" ছবির মতো চিরে নিয়ে তাকে গুঁজে দাও পায়াওয়ালা পাত্রের গায়ে। গলার বাঁশের ওপরদিকে খাঁজ করে নাও ("ক'' ছবি) মাথা বসানোর জন্য। গলার বাঁশের ওপরটা গোল হবে ("খ'' ছবি)। খাঁজে মাথা বসানো হলে—পাতলা পাতি থেকে তৈরি করে নাও, লেজ, ঘাড়ের সাজ, কানের, গলার লাগাম আর তারই মাঝে-মাঝে বসিয়ে দাও বাহারি পুঁতি। মুখের সামনে গিঁটের মধ্যে দাগ দিয়ে মুখ, পুঁতি বসিয়ে নাকের ফুটো আর দু-পাশে চোখ দাও। শেষে ভারনিস।

জেনে রাখো—(১) বাঁশ জোড়ার জন্যে পেরেক আর ফেভিকল ব্যবহার করবে।

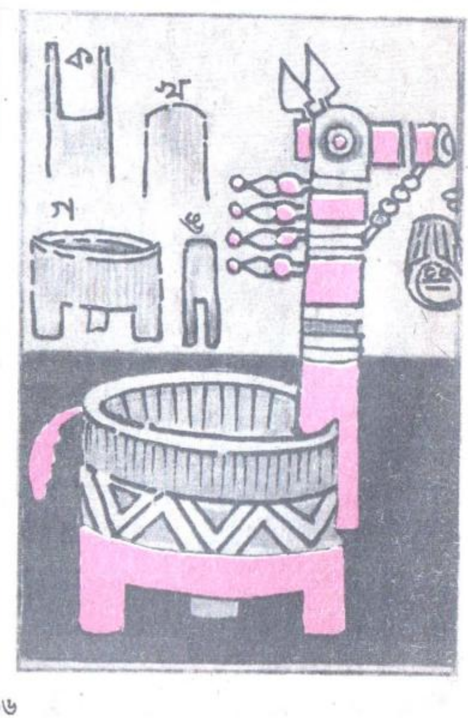

ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালাযন্ত্রনা ভুলে যান!

everest/78/PP/185-bn